বাঁশির সুর

একদা পিং নামের এক ধনী বণিক বাস করতেন। বেচারা! তাঁর কাছে এত বেশি টাকা ছিল যে, সেই টাকা দিয়ে কী করবেন, তা-ই তিনি বুঝে উঠতে পারতেন না।

সারাদিন তিনি কেবল টাকাপয়সার হিসাব-নিকাশ নিয়েই মগ্ন হয়ে থাকতেন। তাঁর ছেলেমেয়েরা যখন তাঁকে খেলার জন্য ডাকত, তখন তিনি উত্তর দিতেন, "সময় নেই, একদম সময় নেই!"

পিংয়ের স্ত্রী তাঁকে নিয়ে খুব দুশ্চিন্তা করতেন। তিনি বলতেন, "তুমি ঠিকমতো খাও না, ঘুমোও না। যদি অসুস্থ হয়ে পড়ো, তবে কী হবে? তোমার সব পরিশ্রমই তো বৃথা হয়ে যাবে!"

পিংয়ের বাড়ির ঠিক পাশেই এক চিলতে জমিতে একটি ছোট কুঁড়েঘর ছিল। সেই কুঁড়েঘরে লি এবং তাঁর স্ত্রী তাঁদের দুই সন্তানকে নিয়ে বাস করতেন। লি ছিলেন একজন দিনমজুর। প্রতিদিন ভোরবেলা তিনি কাজের সন্ধানে মাঠে বেরিয়ে পড়তেন। গোধূলিলগ্নে তিনি ক্লান্ত-শ্রান্ত হয়ে পায়ে হেঁটে বাড়ি ফিরতেন।

কিন্তু গরম জলে স্নান সেরে এক কাপ চা পান করার পর, লি নিশ্চিন্তে বসে তাঁর বাঁশি বাজাতেন । তাঁর স্ত্রী ও সন্তানেরা তখন গান গাইত আর নাচত। তাঁদের সবার কাছেই সেই সময়টুকু ছিল দিনের সেরা মুহূর্ত।

একদিন পিংয়ের স্ত্রী তাঁর স্বামীকে বললেন, "ওগো, লি এবং তাঁর পরিবারটি তো খুবই গরিব; অথচ তাঁদের কন্ঠস্বরে কী অপার আনন্দের সুর! আমরা কেন লি-এর মতো এত আনন্দে থাকতে পারিনা?"





পিং মুহূর্তের জন্য ভাবলেন। তারপর বললেন, "ওরা আনন্দে থাকে, কারণ ওদের হাতে অফুরন্ত সময় আছে।"

তিনি লি-কে ডেকে পাঠালেন এবং বললেন, "ওহে, আমি দিনের পর দিন তোমাকে কঠোর পরিশ্রম করতে দেখেছি। আমি তোমাকে সাহায্য করতে চাই।" এই বলে তিনি লি-এর হাতে মুদ্রায় পূর্ণ একটি থলে তুলে দিলেন এবং বললেন, "দয়া করে তোমার প্রতিবেশী ও বন্ধু হিসেবে আমার এই উপহারটি গ্রহণ করো।"

কিন্তু হায়! যে মুহূর্তটিতে লি টাকার থলেটি হাতে পেলেন, ঠিক সেই মুহূর্ত থেকেই তাঁর মনের সব শান্তি উধাও হয়ে গেল। তিনি বারবার মুদ্রাগুলো গুনতেন; কিন্তু প্রতিবারই গুনে শেষ করার আগেই ভুল করে ফেলতেন এবং আবার প্রথম থেকে গোনা শুরু করতেন। লি-এর স্ত্রী কিংবা মেয়েরা যখন তাঁর হাতে বাঁশিটি তুলে দিতে আসত, তখন তিনি কেবল একটি কথাই বলতেন—"সময় নেই! আমার হাতে একদম সময় নেই!"

এরপর নতুন এক সমস্যার উদয় হল। লি এখন এই টাকা কোথায় লুকিয়ে রাখবেন? তিনি একবার টাকাগুলো একটি হাঁড়িতে রাখলেন, একবার বাক্সে ভরলেন, আবার কখনো বা ঘরের তাকে তুলে রাখলেন। শেষমেশ, তিনি টাকার থলেটি দড়ি দিয়ে বেঁধে কুয়োর ভেতর নামিয়ে রাখলেন।

পরদিন আবার নতুন এক দুশ্চিন্তা এসে ভর করল। তিনি ভাবতে লাগলেন, "আমি আমার এই ধনসম্পদ কীভাবে খরচ করব? আমি কি একটি বলদ কিনব? নাকি একটি লাঙল?" তিনি কুয়োর ভেতর থেকে টাকার থলেটি টেনে তুললেন, মুদ্রাগুলো রোদে শুকাতে দিলেন এবং পুনরায় সেগুলো গুনতে বসলেন। সেদিন গভীর রাতে তিনি ক্লান্ত-শ্রান্ত হয়ে শুতে গেলেন।





সময় গড়িয়ে চলল। লি মুদ্রাগুলো গুনতেন, সেগুলো এদিক-সেদিক করতেন এবং কীভাবে খরচ করা যায়, তার পরিকল্পনা করতেন । আর দিনের শেষে তিনি এতটাই ক্লান্ত হয়ে পড়তেন যে, বাঁশি বাজানোর আর কোনো শক্তিই তাঁর থাকত না।

একদিন সকালে ঘুম থেকে ওঠার পর, পুরনো অভ্যাসের টানেই লি ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন। তিনি বুক ভরে তাজা বাতাস গ্রহণ করলেন এবং সকালের রোদে তার ব্যথাতুর হাড়গুলোকে উষ্ণ হতে দিলেন। তার স্ত্রীও এসে তার পাশে দাঁড়ালেন। "টাকাই সবচেয়ে মূল্যবান বস্তু নয়, স্বামী," তিনি বললেন। লির দুশ্চিন্তাগ্রস্ত মুখের দিকে তাকিয়ে তিনি আরও যোগ করলেন, "ভালোবাসা আর স্নেহ-মমতাই হল সবচেয়ে বেশি মূল্যবান।"



হঠাৎই লি বুঝতে পারলেন তাঁর কী করা উচিত!

তিনি সেই পুরো দিনটি বাঁশের কঞ্চি কাটা আর সেগুলোকে চকচকে করার কাজে ব্যয় করলেন ; যতক্ষণ না তিনি এক ডজন চমৎকার বাঁশি তৈরি করে ফেললেন । তিনি সেই বাঁশিগুলো এবং মুদ্রার থলেটি নিয়ে পিং-এর বাড়িতে উপস্থিত হলেন। "এই টাকা আমার মনের শান্তি কেড়ে নিয়েছে," পিং-এর হাতে থলেটি তুলে দিতে দিতে তিনি বললেন। এরপর তিনি পিং-কে বাঁশিগুলো দিলেন। "দয়া করে আমাদের আশীর্বাদস্বরূপ এগুলো গ্রহণ করো," তিনি বললেন।

কিন্তু পিং এবং তার স্ত্রী কেবল নিজেদের কাজে ফিরে গেলেন।

হঠাৎই পিং-এর ভাগ্য বদলে গেল। তাঁর হাতে গোনার মতো আর কোনো টাকাই অবশিষ্ট রইল না! সময় যেন এক ভারী বোঝার মতো তার হাতের ওপর চেপে বসল। একদিন তিনি লক্ষ্য করলেন, তাকের ওপর একটি বাঁশি অবহেলায় পড়ে আছে। পিং সেটি তুলে নিলেন এবং বাজাতে শুরু করলেন। তাঁর স্ত্রী ও সন্তানরাও পরম আনন্দে তার সাথে যোগ দিল।

এরপর থেকে, পিং এবং তার পরিবারের সবাই প্রতি রাতে বাঁশি বাজাতেন। পিং তার সন্তানদের সাথে কাটানো প্রতিটি মুহূর্তকে মন ভরে উপভোগ করতে শিখলেন।

কারণ প্রবাদেই তো আছে—"সবচেয়ে বড় ধন সোনা নয়, আনন্দ।"

চীনের একটি গল্প



© Katha Jharna 2008

P. Saraswati V. Vijayakanthi

L. S. Saraswathi S. Rajalakshmi

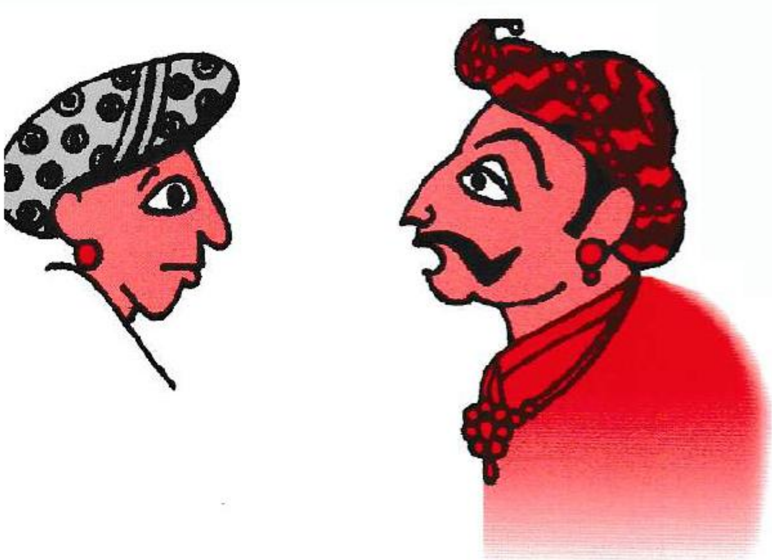
Publisher Rajalakshmi Srinivasan Memorial Foundation

Bengali Sriparna Tamhane

Artist Uma Krishnaswamy

রাজা ও কাঠবিড়ালি

একদা এক প্রতাপশালী রাজা ছিলেন। আহা, কত যুদ্ধই না তিনি করেছিলেন! কত ধনসম্পদই না তিনি জয় করেছিলেন! ইতিহাসের খুব কম শাসকেরই তাঁর সঙ্গে তুলনা করা যেত । একদিন রাজপ্রাসাদের বাগানে হাঁটতে হাঁটতে রাজা তাঁর সবচেয়ে বিশ্বস্ত মন্ত্রীকে বললেন, "আমার সামনে কেউ যেন নিজের বড়াই না করে। কারণ, আমি সব দিক থেকে অন্য সবার চেয়ে শ্রেষ্ঠ।"



বৃদ্ধ মন্ত্রী শুনে স্তম্ভিত হয়ে গেলেন। "আমাকে ক্ষমা করুন, মহারাজ!" তিনি বললেন। "মানুষ তাদের সাফল্যের বড়াই করতে ভালোবাসে। এতে দোষের কী আছে? তারা যদি আপনার সামনে গর্বিত হয়ে কথা বলেও থাকে, তবে তা উপেক্ষা করুন। এটি অতি তুচ্ছ একটি বিষয়।"

রাজা বিস্ময়ে নির্বাক হয়ে গেলেন! ঠিক তখনই একটি কর্কশ শব্দ তাঁর চিন্তায় ব্যাঘাত ঘটাল। একটি কাঠবিড়ালি গাছের ডালে বসে তাঁর দিকে তাকিয়ে কিচিরমিচির করছিল। তার থাবায় ধরা ছিল একটি মুদ্রা।

রাজা কৌতূহল নিয়ে কাঠবিড়ালিটির দিকে তাকিয়ে রইলেন। হঠাৎ সেটি গান গেয়ে উঠল!

"ধনসম্পদের এই খেলায়, এ তো স্পষ্ট সবার কাছে—
স্বয়ং রাজাও আমার প্রতি ঈর্ষান্বিত আজ!"



এই অর্থহীন গান শুনে বিরক্ত হয়ে রাজা কাঠবিড়ালিটিকে ধরার জন্য লাফিয়ে উঠলেন; কাঠবিড়ালিটি তখন তার মুদ্রাটি ফেলে দিয়ে দ্রুত পালিয়ে গেল। রাজা ক্ষিপ্রতার সাথে মুদ্রাটি লুফে নিলেন এবং মন্ত্রীর কাছে ফিরে এলেন—ততক্ষণে তাঁর মেজাজ আবার ফুরফুরে হয়ে উঠেছে। "আমি আপনার পরামর্শই মেনে চলব," তিনি প্রতিজ্ঞা করলেন।

কিন্তু সেই সন্ধ্যায় যখন রাজা তাঁর অতিথিদের আপ্যায়নে ব্যস্ত ছিলেন, ঠিক তখনই সেই কাঠবিড়ালিটি আবার সেখানে হাজির হল! সেটি ওপর থেকে নিচে লাফিয়ে নামল এবং গান গেয়ে উঠল—

"রাজা আমার মুদ্রাটি চুরি করে নিয়েছেন!

এ কথা আমি গাইব, গাইব আর গাইতেই থাকব!"

বেচারা রাজা! নিজের প্রতিজ্ঞার কথা ভুলে গিয়ে তিনি কাঠবিড়ালিটিকে তাড়া করার জন্য উঠে দাঁড়ালেন। কিন্তু সব অতিথি তখন তাঁর দিকেই তাকিয়ে ছিলেন। অত্যন্ত কষ্টে তিনি নিজের ক্রোধ সংবরণ করলেন। কী ভাগ্যবান সেই কাঠবিড়ালি!

রাজপ্রাসাদে সকালবেলা ছিল দান-খয়রাতের সময়। পরদিন সকালে কাঠবিড়ালিটি রাজপ্রাসাদের ফটকে এসে গান ধরল—

"কী গর্বের সাথেই না রাজা গরিবদের মাঝে তাঁর ধনসম্পদ বিলিয়ে দিচ্ছেন!

আর আজ, আমার সেই মুদ্রার সুবাদেই তিনি আরও বেশি দান করতে পারছেন!"

"কেউ কি ওই কাঠবিড়ালিটাকে ধরতে পারবে?" রাজা গর্জন করে উঠলেন। কিন্তু কাঠবিড়ালিটি ততক্ষণে দৌড়ে পালিয়ে গেছে।







দুপুরের খাবারের সময় সেটি আবার এল এবং গান গেয়ে উঠল—

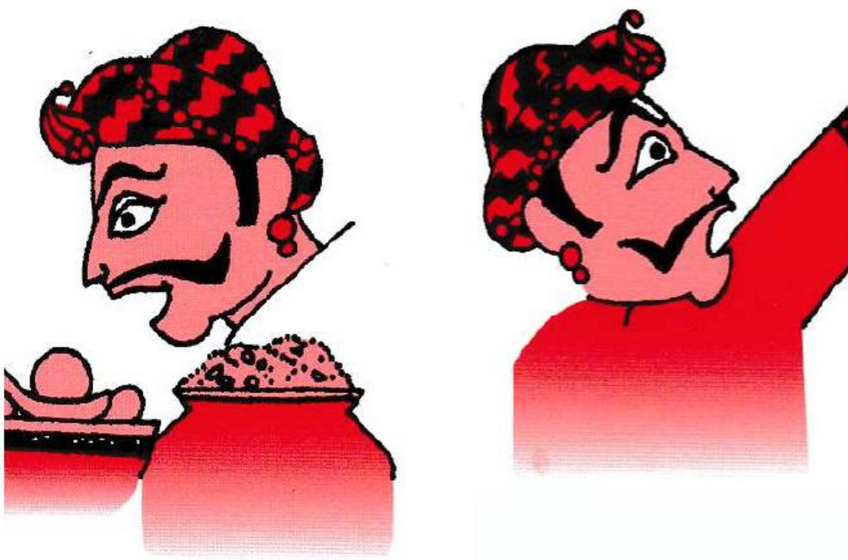
"ও মহারাজ! আমি দেখছি আপনি বেশ তৃপ্তি নিয়েই উপভোগ করছেন—

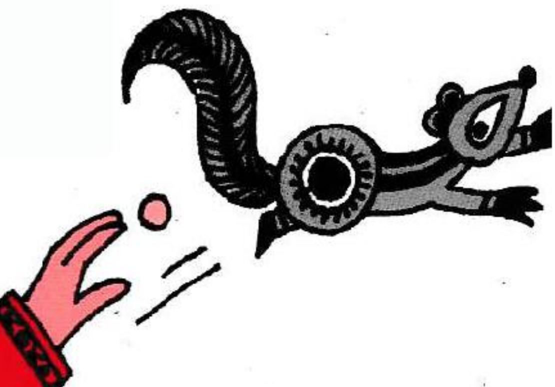
সেই খাবার, যা আপনি কিনেছেন আমারই মুদ্রা দিয়ে!"

রাজা ক্রোধে উন্মত্ত হয়ে লাফিয়ে উঠলেন। তিনি কাঠবিড়ালিটিকে জাপটে ধরার চেষ্টা করলেন, কিন্তু সেটি তাঁর নাগালের বাইরে লাফিয়ে সরে গেল এবং দ্রুত দৌড়ে পালিয়ে গেল। বিকেলের বাকি সময়টুকু তিনি এক নিদারুণ একাকীত্বের মধ্যে কাটালেন ।

চা-পানের সময় তিনি খাওয়া-দাওয়া বাদ দিয়ে একদম নিশ্চল হয়ে বসে থাকলেন এবং কাঠবিড়ালিটির আগমনের অপেক্ষায় রইলেন । দেখতে দেখতেই সেটি এসে হাজির হল এবং গেয়ে উঠল:

"খাও, খাও, ওগো রাজা! আমার ধনসম্পদ কীভাবে খরচ করবে তার ফন্দি আঁটতে গিয়ে নিজের স্বাস্থ্যের ক্ষতি কোরো না!"





এ কথা রাজার পক্ষে আর সহ্য করা সম্ভব হল না।

তিনি কাঠবিড়ালিটিকে লক্ষ্য করে নিখুঁত নিশানায়, নিজের সর্বশক্তি দিয়ে একটি মুদ্রা ছুঁড়ে মারলেন।

কাঠবিড়ালিটি ক্ষিপ্রতার সাথে ছুঁড়ে মারা মুদ্রাটির পাশ কাটিয়ে সরে গেল। তারপর সেই মুদ্রাটি কুড়িয়ে নিয়ে গেয়ে উঠল—

" তিনি এটা ফিরিয়ে দিয়েছেন! তিনি এটা ফিরিয়ে দিয়েছেন! আমার ভয়েই তিনি এটা ফিরিয়ে দিয়েছেন!"

রাজা সারা রাত জেগে কাটালেন। পরদিন সকালে তিনি তাঁর মন্ত্রীকে বললেন, "আমি আমার রাজ্যকে কাঠবিড়ালিমুক্ত করব!" এই বলে তিনি তাঁর সেনাপতিদের তলব করার নির্দেশ দিলেন। মন্ত্রী তাঁকে বুঝিয়ে-সুজিয়ে শান্ত করার চেষ্টা করলেন। তিনি বললেন, "কাঠবিড়ালির সংখ্যা অগণিত। আমরা কীভাবে তাদের সবাইকে খুঁজে বের করব?"

"আমার সেনাবাহিনী পৃথিবীর সেরা," রাজা উত্তর দিলেন। "তারা সব কাঠবিড়ালিকেই খুঁজে বের করবে!"

মন্ত্রী তাঁকে আরও বোঝানোর চেষ্টা করলেন। "বেশ, কিন্তু সৈন্যদের কথা একবার ভাবুন। তারা কি এত ছোট ও অসহায় প্রাণীদের হত্যা করতে রাজি হবে? আর আপনি, মহারাজ— আপনি কি এমন একজন রাজা হিসেবে ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে থাকতে চান, যিনি কাঠবিড়ালিদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছিলেন?"

মন্ত্রীর কথায় রাজার যুদ্ধ-পরিকল্পনার সেখানেই ইতি ঘটল। তিনি স্বীকার করে বললেন, "আমি তো তাহলে হাসির পাত্রে পরিণত হব! কিন্তু এখন আমার কী করা উচিত?"





"মহারাজ! কাঠবিড়ালিটিকে উপেক্ষা করুন!" মন্ত্রী পরামর্শ দিলেন। "আপনি যদি শুরু থেকেই তা করতেন, তবে আপনার মানসিক শান্তিটুকু হারাতেন না।"

সকালের নাস্তার সময় যখন কাঠবিড়ালিটি কিচিরমিচির করতে করতে সেখানে এল, তখন রাজা গেয়ে উঠলেন—

"পৃথিবীর জ্ঞানীজনেরা বলে থাকেন যে—রাজা কাঠবিড়ালির সমকক্ষ নন!"

কাঠবিড়ালিটি তো হতবাক হয়ে গেল! সেটি নিঃশব্দে রাজপ্রাসাদ ত্যাগ করল এবং এরপর আর কখনোই সেখানে তাকে দেখা গেল না।

একটি ভারতীয় লোককথা (মনোজ দাসের পুনর্কথনের ওপর ভিত্তি করে রচিত)

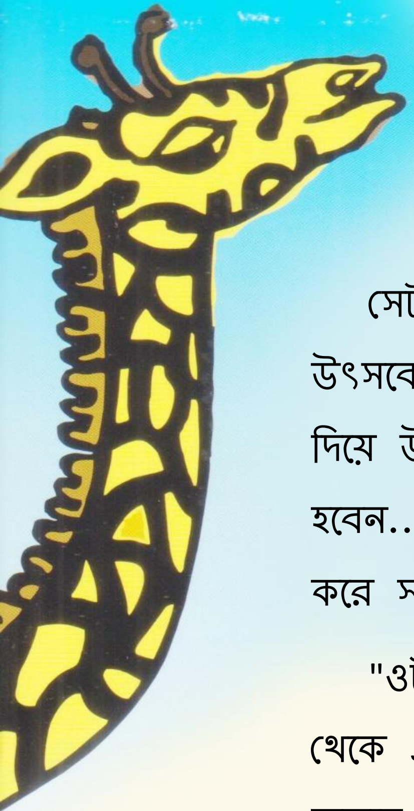
Publisher Rajalakshmi Srinivasan Memorial Foundation

P. Saraswati V. Vijayakanthi

L. S. Saraswathi S. Rajalakshmi

Bengali Sriparna Tamhane

Artist Uma Krishnaswamy





93 অসম্ভব সব গল্প

সেটা ছিল পূর্ণিমার রাত। বনের সব প্রাণী তখন উৎসবে মেতেছিল। "সবাই এদিকে মনোযোগ দাও!" হাঁক দিয়ে উঠল ভালুক। "আজ রাতে আমাদের প্রধান অতিথি হবেন... বনের সবচেয়ে বয়স্ক প্রাণীটি! আপনি কি দয়া করে সামনে এগিয়ে আসবেন?"

"ওটা তো আমিই!" "না, আমিই সেই প্রাণী!"—চারদিক থেকে এমন সব চিৎকার ভেসে এল। বেশ কয়েকটি প্রাণী অত্যন্ত আগ্রহের সঙ্গে ভালুকের দিকে এগিয়ে এল।

ভালুকটি পড়ে গেল মহা বিপদে। সে এখন কীভাবে বুঝবে যে, আসলে কে সবচেয়ে বয়স্ক?

হঠাৎ বাঁদরের মাথায় একটা বুদ্ধি এল। "চলো, আমরা একটা প্রতিযোগিতার আয়োজন করি," সে বলল। "দেখা যাক, কে তার বয়সের আধিক্য বা প্রবীণতা সম্পর্কে আমাদের বিশ্বাস করাতে পারে।" বনের অন্য প্রাণীরাও এতে সায় দিল। এভাবেই শুরু হলো সেই প্রতিযোগিতা।





প্রথমে কথা বলল হাতি। সে বলল, "আমি যখন এই বনে এসেছিলাম, তখন এখানে অন্য কোনো প্রাণীই ছিল না। আমি একাই ঘুরে বেড়াতাম, একদম নিঃসঙ্গ হয়ে।"

"আহা!" ডানা ঝাপটাতে ঝাপটাতে টিয়াপাখি বলে উঠল, "আমি যখন এই জায়গায় এসেছিলাম, তখন তো এখানে কোনো বনই ছিল না! আমিই তো নিজেই গাছগুলো লাগিয়েছিলাম এবং সেগুলোর যত্ন নিয়েছিলাম।"

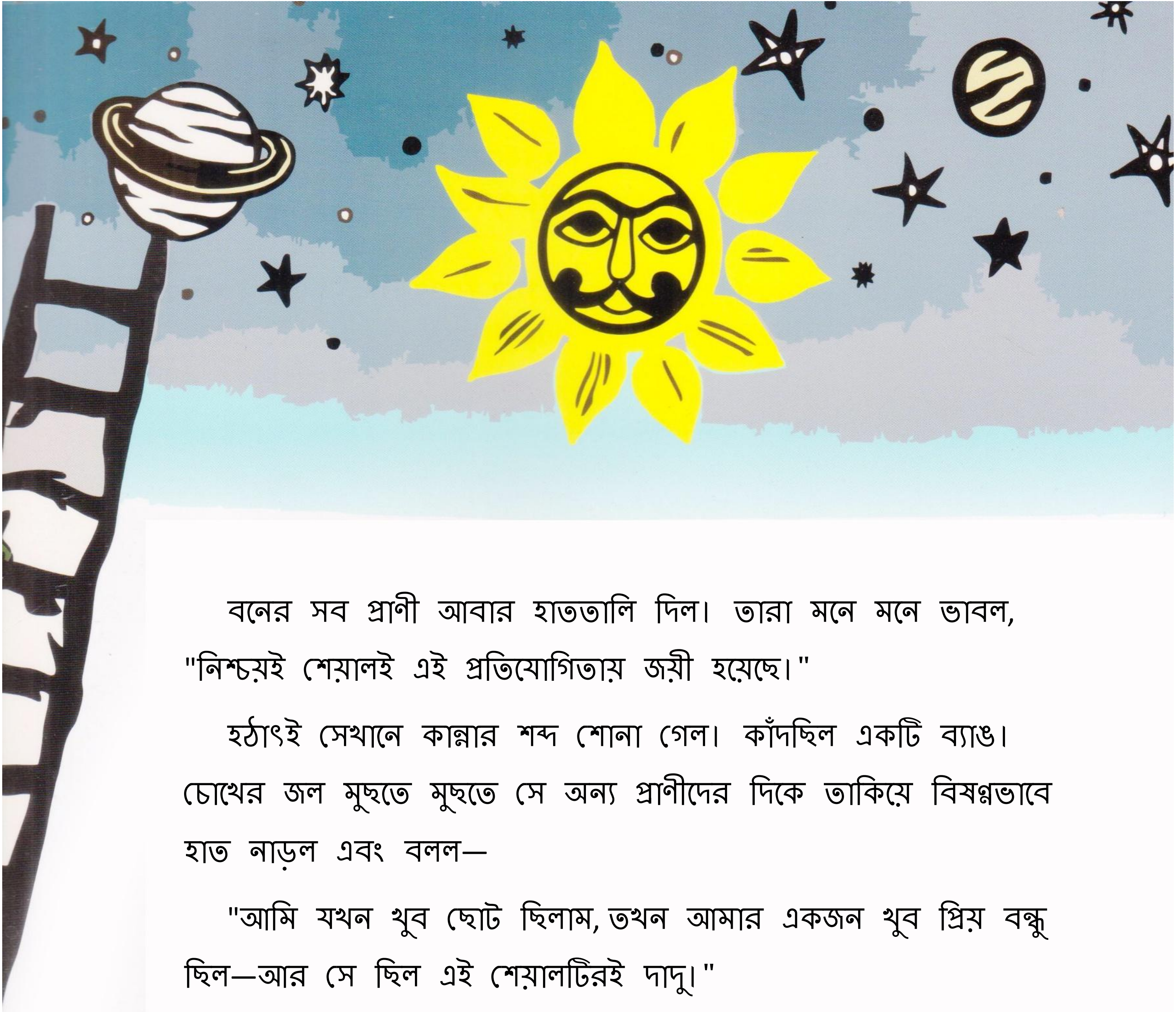
"একদম ঠিক কথা!" সামনে এগিয়ে এসে হরিণ বলল। "আমি নিজের চোখে তোমাকে বীজ বুনতে দেখেছিলাম! আমি তখন আকাশ থেকে মই বেয়ে নিচে নেমে আসছিলাম। আমি ঠিক সেই মুহূর্তেই সূর্য, চাঁদ আর তারাগুলোকে আকাশে টাঙানোর কাজ শেষ করে নেমেছিলাম।"

বনের সব প্রাণী হরিণের জন্য হাততালি দিল। তারা মনে মনে ভাবল, "এই তো আমাদের বিজয়ী!"

কিন্তু ঠিক তখনই শেয়াল তার বসার জায়গা থেকে উঠে দাঁড়াল। সে বয়সের ভারে ধীর-স্থির ও গাম্ভীর্যপূর্ণ পদক্ষেপে সামনে এগিয়ে এল।

সে বলল, "হরিণ যে মই বেয়ে উপরে উঠে সূর্য, চাঁদ আর তারাগুলোকে আকাশে টাঙিয়েছিল—সেই মইটি কিন্তু আমিই বানিয়েছিলাম! আমিই গাছ কেটেছিলাম, মইয়ের দুই পাশের খুঁটি আর মাঝখানের ধাপগুলো তৈরি করে সেগুলোকে জোড়া লাগিয়েছিলাম। কী যে বিশাল একটা কাজ ছিল সেটা! আমি ঠিক সময়েই কাজ শেষ করে মইটি দাঁড় করিয়ে দিয়েছিলাম, যাতে হরিণ সেটা বেয়ে উপরে উঠতে পারে।"





বনের সব প্রাণী আবার হাততালি দিল। তারা মনে মনে ভাবল, "নিশ্চয়ই শেয়ালই এই প্রতিযোগিতায় জয়ী হয়েছে।"

হঠাৎই সেখানে কান্নার শব্দ শোনা গেল। কাঁদছিল একটি ব্যাঙ। চোখের জল মুছতে মুছতে সে অন্য প্রাণীদের দিকে তাকিয়ে বিষণ্নভাবে হাত নাড়ল এবং বলল—

"আমি যখন খুব ছোট ছিলাম, তখন আমার একজন খুব প্রিয় বন্ধু ছিল—আর সে ছিল এই শেয়ালটিরই দাদু।"

"একদিন আমার সেই বন্ধু আমাকে উপহার হিসেবে কিছু ফল দিয়েছিল।" সেই ফলের ভেতরেই ছিল সেই বীজ, যা থেকে জন্ম নিয়েছিল সেই গাছ—যে গাছ দিয়ে শিয়াল বানিয়েছিল সেই মই, আর যে মই বেয়ে হরিণ উঠে গিয়ে টাঙিয়ে দিয়েছিল সূর্য, চাঁদ আর তারাদের!

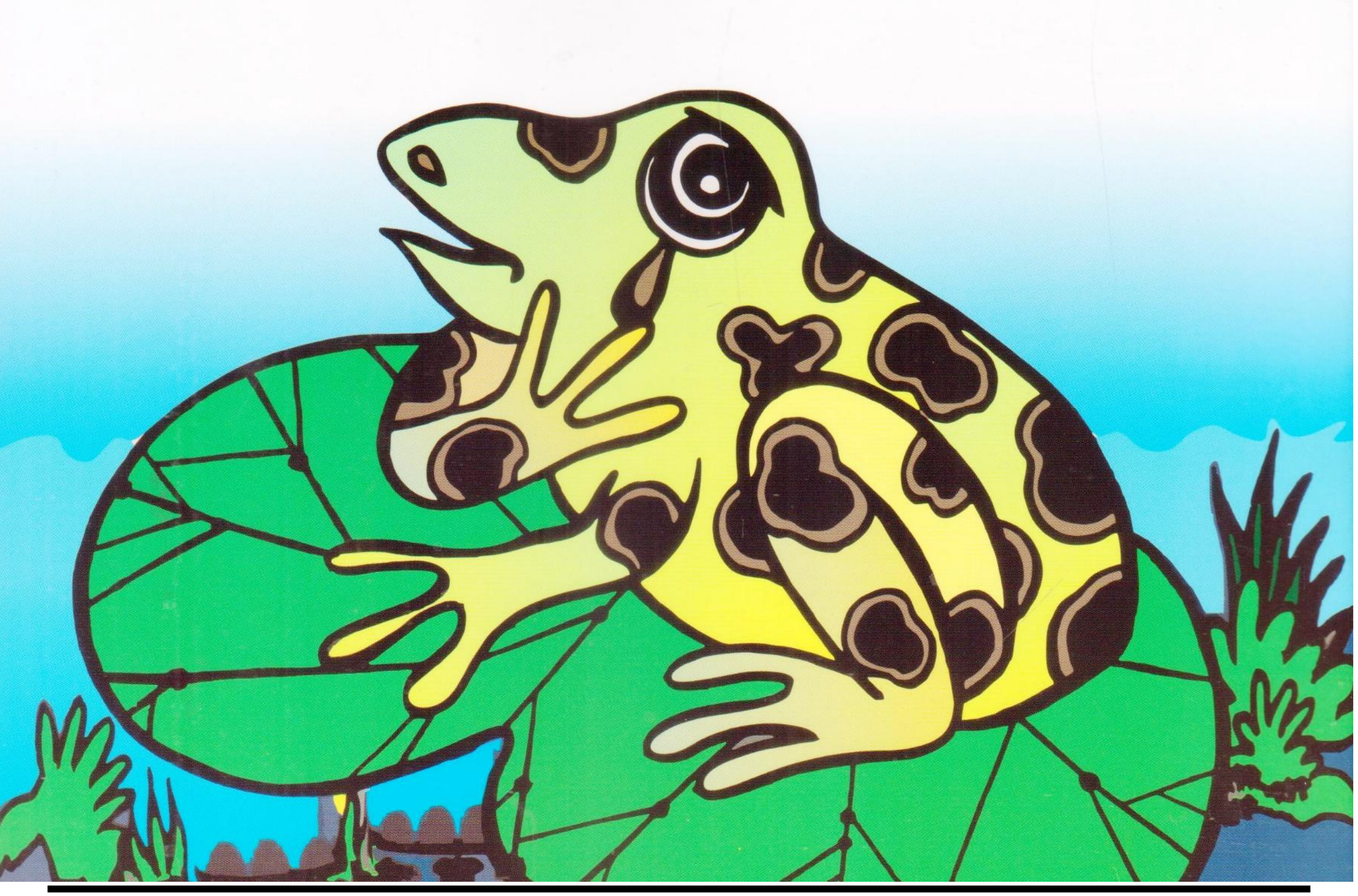
"আমার ছোটবেলার বন্ধুর সাথে কতদিন দেখা হয়নি! এখন আমার মনে ভিড় করে আসছে কত কত স্মৃতি! ঠিক এই কারণেই আমার চোখে জল।"

সবাই গভীর মনোযোগ দিয়ে ব্যাঙের কথা শুনছিল। যখন ব্যাঙ কথা বলা থামাল, তখন এমনকি শিয়ালও নিজের চোখ থেকে অশ্রু মুছছিল। ব্যাঙের গল্প বলার জাদু ছিল এমনই!

সব পশু-পাখি একবাক্যে ব্যাঙকেই প্রধান অতিথি হিসেবে ঘোষণা করল। এবার ব্যাঙের চোখ থেকে সত্যিই জল গড়িয়ে পড়ল—তবে সে জল ছিল আনন্দের অশ্রু!

পূর্ণিমার সেই ভোজসভা ছিল অত্যন্ত জমকালো।

সব পশু-পাখিই সেই ভোজ দারুণ উপভোগ করল; তাদের অনেকেই দীর্ঘক্ষণ ধরে আকাশের দিকে তাকিয়ে রইল।



Publisher Rajalakshmi Srinivasan Memorial Foundation

P. Saraswati V. Vijayakanthi

L. S. Saraswathi S. Rajalakshmi

Bengali Sriparna Tamhane

Artist Uma Krishnaswamy

টুপ-টাপ!

সেটা ছিল এক ঝড়ের রাত । বৃষ্টির ধারা গাছের ওপর সজোরে আছড়ে পড়ছিল। বাতাস গাছের শাখা-প্রশাখাগুলোকে এদিক-সেদিক টেনে-হিঁচড়ে নাড়া দিচ্ছিল। গুহা আর গর্তের ভেতর প্রাণীরা ভয়ে লুকিয়ে ছিল। কিন্তু ঠিক তখনই...



একটি বাঘ বন থেকে লাফিয়ে বেরিয়ে এল এবং গ্রামের দিকে ছুটে গেল। সে একটি কুঁড়েঘরের দেয়ালের পাশে আশ্রয় নিল।

দেয়ালের সাথে গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে বাঘটি শুনতে পেল এক বৃদ্ধা আপনমনে বিড়বিড় করে বলছেন, "এই 'টুপ-টাপ' আমাকে একেবারে ক্লান্ত করে দিয়েছে !"

বৃদ্ধা যখন তাঁর টেবিল আর বাক্সগুলো জলের নাগাল থেকে সরিয়ে নিচ্ছিলেন, তখন সেগুলোর একে অপরের সাথে ধাক্কা লাগছিল। "ধুম, ধাম, ঠক, ঠক!" সেই শব্দে কুঁড়েঘরের দেয়ালগুলো কেঁপে উঠল। "এই 'টুপ-টাপ' আবার কী জিনিস?" ভয়ে মিউমিউ করে উঠল বাঘটি।

এদিকে ভোলোনাথ তার গাধাটিকে খুঁজছিলেন। অন্ধকারের মধ্যে আর মুষলধারে বৃষ্টির কারণে তিনি কিছুই ঠিকমতো দেখতে পাচ্ছিলেন না। ওহ! দাদুর কুঁড়েঘরের পাশে ওটা কী দাঁড়িয়ে আছে? "ওটা নিশ্চয়ই আমার গাধা!" তিনি মনে মনে ভাবলেন।

ভোলোনাথ বাঘটির দিকে ছুটে গেলেন এবং তার কান মলে দিলেন। "আমি তোমাকে সব জায়গায় খুঁজে বেড়াচ্ছি!" তিনি চেঁচিয়ে বললেন। "দুষ্টু কোথাকার!" রাগে অগ্নিশর্মা হয়ে তিনি বাঘটির পিঠে চড়ে বসলেন। বাঘটিকে চলতে বাধ্য করার জন্য তিনি তার পাঁজরে লাথি মারতে লাগলেন।

এই সব নতুন অভিজ্ঞতায় ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে বাঘটি ভোলোনাথের প্রতিটি আদেশ মেনে চলল। বাড়ি ফিরে ভোলোনাথ বাঘটিকে বেঁধে রাখলেন এবং ভেতরে গিয়ে ঘুমিয়ে পড়লেন। পরদিন সকালটা ছিল বেশ পরিষ্কার ও ঝলমলে। ভোলোনাথের স্ত্রী ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন। বাঘটিকে দেখেই তিনি বিকট চিৎকার করে উঠলেন—"আআআআহ!" ভোলোনাথ দৌড়ে বাইরে এলেন। "ওওওওহ!" তিনিও ভয়ে চিৎকার করে উঠলেন। তিনি তাঁর স্ত্রীকে টেনে ঘরের ভেতরে নিয়ে গেলেন। দুজনে মিলে দুম করে দরজাটা বন্ধ করে দিলেন।

এবার গ্রামের লোকজন দৌড়ে সেখানে এল। বাঘটিকে দেখেই তারাও ভয়ে আতঙ্কে চিৎকার করে উঠল। তারা যে যার মতো যেদিকে পারল, ছুটে পালাল।

বেচারা বাঘ! কী হট্টগোল আর বিশৃঙ্খলাই না শুরু হলো! সে তাকে বাঁধা দড়িটা দাঁত দিয়ে কেটে ফেলল। তারপর দৌড়ে আবার বনের ভেতর পালিয়ে গেল।



এদিকে, ভোলোনাথের বাঘের পিঠে চড়ার খবর সারা গ্রামে ছড়িয়ে পড়ছিল। "আর আমি যে শুধু ওটুকুই করেছি, তা নয়!" তিনি গর্ব করে বললেন। "আমি তো বাঘটার কানও মলে দিয়েছিলাম!" বাঘের সাথে সাথেই তাঁর মনের ভয়ও উধাও হয়ে গিয়েছিল। এখন তিনি নিজেকে নিয়ে বেশ গর্ব অনুভব করছিলেন। তিনি কতই না সাহসী! বাঘের পিঠে সওয়ার!

ভোলেনাথের বাঘের পিঠে চড়ার খবর গ্রামের সীমানা ছাড়িয়ে দূর-দূরান্তের গ্রামাঞ্চলেও ছড়িয়ে পড়ল। অবশেষে সেই খবর রাজার কানেও পৌঁছাল। কী এক বিস্ময়কর ঘটনা! তাঁরই রাজ্যে এমন একজন বীরের বসবাস!

রাজা ভোলেনাথকে ডেকে পাঠালেন। তিনি ভোলেনাথকে উপহারে ভরিয়ে দিলেন। "তুমি সত্যিই একজন মহান বীর!" তিনি ভোলেনাথকে বললেন। ভোলেনাথ গ্রামের একজন অত্যন্ত গণ্যমান্য ব্যক্তিতে পরিণত হলেন। সবাই তাঁকে শ্রদ্ধা করত এবং তাঁর প্রশংসা করত। ভোলেনাথ ছিলেন পরম তৃপ্ত!

কয়েক মাস কেটে গেল। হঠাৎ শত্রুবাহিনী রাজ্যের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। রাজার সেনাবাহিনী চরম সংকটে পড়ে গেল। রাজার মনে পড়ল ভোলেনাথের কথা। তিনি তাঁর ভৃত্যদের বললেন, "যাও, সেই বীরকে ডেকে আনো যে বাঘের পিঠে চড়েছিল। তাকে একটি যুদ্ধের ঘোড়া দাও। সে আমাদের শত্রুদের ধূলিসাৎ করে দেবে!"

রাজার আদেশ শুনে ভোলেনাথ তো হতবাক! "আমি তো একজন সাধারণ কৃষক মাত্র!" তিনি বললেন। "আমি কীভাবে একটি সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে লড়াই করব?" কিন্তু আর কোনো উপায় ছিল না। তাই তিনি যথাসাধ্য চেষ্টা করে ঘোড়ার পিঠে চড়ে বসলেন।



সঙ্গে সঙ্গেই তিনি চিৎকার করে উঠলেন, "আমি পড়ে যাচ্ছি!" তাঁর স্ত্রী একটি লম্বা দড়ি নিয়ে এলেন এবং ভোলেনাথের হাত, পা ও শরীর ঘোড়ার সাথে শক্ত করে বেঁধে দিলেন।

ঘোড়াটি বাতাসের বেগে শত্রুবাহিনীর দিকে ছুটে চলল! বেচারা ভোলেনাথ জানতেনই না কীভাবে ঘোড়াটিকে থামাবেন! মরিয়া হয়ে তিনি একটি গাছের ডাল আঁকড়ে ধরলেন। পুরো গাছটিই গোড়া থেকে উপড়ে এল! সেটি তাঁর মুষ্টিবদ্ধ হাতের মুঠোয় বিশাল এক বর্শার মতো শোভা পেতে লাগল। ভয়ে তিনি চিৎকার করে উঠলেন।

শত্রুসৈন্যরা দেখল ভোলেনাথ তাদের দিকেই এগিয়ে আসছেন। "ওকে দেখ!" একজন বলল। "ও তো আস্ত একটা গাছকে বর্শা হিসেবে ব্যবহার করছে!" "ওর ঘোড়াটা তো আমার এযাবৎ দেখা সবচেয়ে হিংস্র ঘোড়া!" অন্য একজন বলল। আরেকজন সৈন্য বলল, "ওর যুদ্ধের হুঙ্কারটা শোনো! ও তো যেন ঝাঁপিয়ে পড়া বাঘের মতোই চিৎকার করছে!"



"ওহ! নিশ্চয়ই এ সেই বীর যে বাঘের পিঠে চড়েছিল!" তারা বুঝতে পারল। তারপর তারা সবাই প্রাণ বাঁচাতে যে যার মতো দৌড়ে পালাল।

অবশেষে, ঘোড়াটি এসে থামল। সেটি দাঁত দিয়ে সেই দড়িটি কেটে ফেলল যা দিয়ে ভোলেনাথকে ঘোড়ার জিনের সাথে বেঁধে রাখা হয়েছিল। গাছটি ভোলেনাথের হাত থেকে খসে পড়ল এবং তিনি ধপাস করে মাটিতে লুটিয়ে পড়লেন।

"আমি বেঁচে আছি!" বিস্ময়ের সাথে তিনি মনে মনে ভাবলেন। তিনি ঘোড়ার লাগাম হাতে তুলে নিলেন এবং বাড়ির পথে হাঁটতে শুরু করলেন। তিনি কি আর কখনো ঘোড়ার পিঠে চড়বেন? ক্লান্ত পায়ে পথ চলতে চলতে তিনি লক্ষ্য করলেন যে, লোকজন তাঁর দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। তারা বলাবলি করছিল—"এই তো সেই ব্যক্তি, যিনি একাই একটি আস্ত সেনাবাহিনীকে পরাজিত করেছেন! অথচ দেখুন, তিনি কেমন সাধারণ মানুষের মতোই মাটিতে হেঁটে চলেছেন!" তাই তিনি যখন পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন, তখন তারা বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে তাঁকে নমস্কার জানাল।

একটি ভারতীয় লোককথা

Publisher Rajalakshmi Srinivasan Memorial Foundation

P. Saraswati V. Vijayakanthi

L. S. Saraswathi S. Rajalakshmi

Bengali Sriparna Tamhane

Artist Uma Krishnaswamy

যুধিষ্ঠির ও যক্ষ

তাদের বারো বছরের দীর্ঘ নির্বাসনের প্রায় শেষ সময় তখন। তারা বনের ভেতর দিয়ে একটি হরিণের পিছু ধাওয়া করছিল। হরিণটি তাদের অনেক দূর পর্যন্ত নিয়ে গেল এবং তারপর হঠাৎ অদৃশ্য হয়ে গেল...

ক্লান্ত পাণ্ডবরা বিশ্রাম নেওয়ার জন্য বসে পড়লেন। বিষণ্ণ মনে তারা সেই হরিণটির কথা আলোচনা করতে লাগলেন, যা তাদের হাত ফসকে পালিয়ে গেল। যুধিষ্ঠির বুঝতে পারলেন যে, তাদের মন ভালো করার জন্য কোনো কাজের প্রয়োজন। তাই তিনি নকুলকে ডেকে বললেন—

"ভাই নকুল, আমার খুব তৃষ্ণা পেয়েছে।"

নকুল উঠে দাঁড়াল। "আমি গিয়ে জল নিয়ে আসছি," সে বলল।

সে একটি গাছে চড়ে চারপাশটা ভালো করে দেখে নিল। ওহ, কী সৌভাগ্য! কাছেই একটি পুকুর দেখা যাচ্ছে। সে গাছ থেকে নেমে সেই পুকুরের দিকে এগিয়ে গেল। পুকুরের পাড়ে পৌঁছাতেই সে তীব্র তৃষ্ণায় কাতর হয়ে পড়ল। জল পান করার জন্য সে দুহাত অঞ্জলি করে ধরল। ঠিক তখনই চারপাশ থেকে একটি কণ্ঠস্বর ভেসে এল!

"থামুন! আমার প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার পরেই কেবল আপনি জল পান করতে পারবেন," কণ্ঠস্বরটি বলল। কিন্তু নকুল সেই কণ্ঠস্বরকে উপেক্ষা করল। সে এক অঞ্জলি জল পান করল। আর ঠিক তখনই সে মাটিতে লুটিয়ে পড়ল এবং প্রাণ হারাল!







নকুল যখন আর ফিরে এল না, তখন যুধিষ্ঠির তাকে খুঁজতে সহদেবকে পাঠালেন। সহদেব সেই পুকুরটির কাছে পৌঁছাল এবং তীব্র তৃষ্ণায় কাতর হয়ে পড়ল। সেও জল পান করার জন্য দুহাত অঞ্জলি করে ধরল। একটি কন্ঠস্বর তাকে বাধা দিল। নিজের যমজ ভাইয়ের মতোই সহদেবও সেই কন্ঠস্বরকে অগ্রাহ্য করল এবং জল পান করল। সে-ও মাটিতে লুটিয়ে পড়ল এবং প্রাণ হারাল!

এরপর এলেন অর্জুন। তিনি দেখলেন, তাঁর ভাইয়েরা মাটিতে নিথর হয়ে পড়ে আছেন। তিনি যখন হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে ছিলেন, ঠিক তখনই একটি কন্ঠস্বর তাঁকে চ্যালেঞ্জ জানাল। অর্জুন বুঝতে পারলেন যে, এই সেই শত্রু যে তাঁর ভাইদের হত্যা করেছে!

"অদৃশ্য শত্রু! দেখে নে, আমি তোর কী দশা করি!" অর্জুন বললেন। ঠিক তখনই তিনিও তীব্র তৃষ্ণায় কাতর হয়ে পড়লেন। "একটু জল পান করে নিই, তারপরই তোর সাথে লড়াই হবে," তিনি বললেন। তিনি জল পান করলেন এবং মাটিতে লুটিয়ে পড়ে প্রাণ হারালেন।

উদ্বেগ নিয়ে দীর্ঘক্ষণ অপেক্ষা করার পর যুধিষ্ঠির ভীমের দিকে ফিরলেন— "প্রিয় ভাই! মহাবীর অর্জুনও এখনো ফিরে আসেনি। নিশ্চয়ই কোনো ভয়াবহ অঘটন ঘটেছে। দয়া করে তুমি গিয়ে খোঁজ নিয়ে এসো। আর হ্যাঁ, জলও নিয়ে এসো! আমি তৃষ্ণায় প্রাণ হারাতে বসেছি!" ভীম একটি কথাও না বলে দ্রুত পায়ে সেদিকে ছুটে গেলেন। তিনি যখন পুকুরটির কাছে পৌঁছালেন, তখন দেখলেন তাঁর ভাইয়েরা সেখানে মাটিতে পড়ে আছেন। হঠাৎই তিনি একটি কন্ঠস্বর শুনতে পেলেন। ভীম সেই কন্ঠস্বরের হুমকিকে তুচ্ছজ্ঞান করলেন এবং জল পান করলেন। তার ভাইদের মতোই সেও লুটিয়ে পড়ে প্রাণ হারাল।

অবশেষে যুধিষ্ঠির সেখানে এলেন—তৃষ্ণা আর উদ্বেগের তাড়নায় তিনি সেখানে ছুটে এসেছিলেন। ভাইদের নিথর দেহে সেখানে পড়ে থাকতে দেখে তিনি অঝোরে কাঁদতে ও বিলাপ করতে শুরু করলেন। তিনি ছুটে তাদের কাছে গেলেন এবং তাদের মুখমণ্ডল স্পর্শ করলেন। "শুধুমাত্র এই পরিণতির জন্যই কি আমরা নির্বাসনের এতগুলো বছর সহ্য করেছিলাম? হায়, আমার হৃদয় যে ভেঙে যাচ্ছে! এমন পৃথিবীতে আমি আর কীভাবে বেঁচে থাকব!"



তখন এক গম্ভীর কন্ঠস্বর বলে উঠল, "তোমার অনুজ ভাইয়েরা আমার কথা অমান্য করে জল পান করেছিল। নিজেদের সেই ঔদ্ধত্যের মূল্য তাদের দিতে হয়েছে। তুমি অন্তত, নিজের তৃষ্ণা নিবারণ করার আগে আমার প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও।"

যুধিষ্ঠির বুঝতে পারলেন যে, এটি ছিল এক যক্ষের কন্ঠস্বর।

"আপনার প্রশ্নগুলো করুন," তিনি বললেন।

যক্ষ: যারা বিপদে পড়ে তাদের কে রক্ষা করে?

যুধিষ্ঠির: সাহস।

-মানুষ কীভাবে জ্ঞানী হয়?

-জ্ঞানীদের সান্নিধ্যে থেকে।

-পৃথিবীর থেকে বেশি কে লালন পালন করতে পারে?

-মা।

-বাতাসের থেকে বেশি দ্রুতগামী কে?

-মন।

-পথিকের শ্রেষ্ঠ বন্ধু কে?

-বিদ্যা।

-সুখ কী?

-মন ও কর্মের মধ্যে সামঞ্জস্য; সদাচরণ।

-সকলের ভালোবাসা পেতে হলে মানুষকে কী ত্যাগ করতে হয়?

-অহংকার।

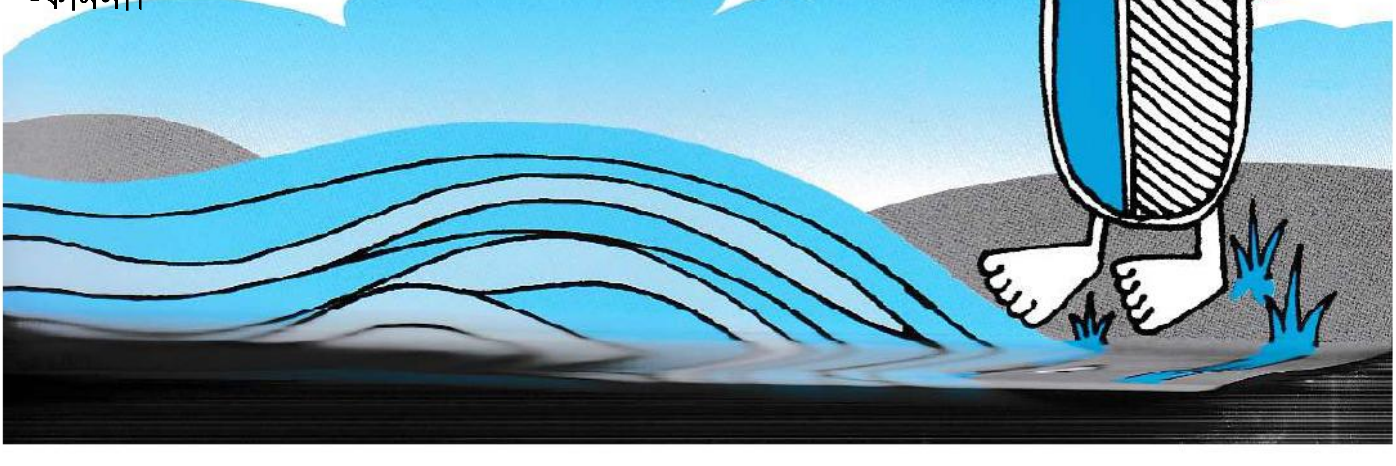
-কোন ক্ষতিতে দুঃখ নয়, বরং আনন্দ লাভ হয়?

-ক্রোধ বর্জন করা ।

-ধনী হতে হলে মানুষকে কী ত্যাগ করতে হয়?

-কামনা।







-সাফল্যের প্রথম শর্ত কী?

-অক্লান্ত প্রচেষ্টা।

-লাভের মধ্যে শ্রেষ্ঠ লাভ কোনটি?

-নিরাময় বা রোগমুক্ত অবস্থা।

-মৃত্যুর পর মানুষের সঙ্গী কে হয়?

-মৃত্যুর পর একমাত্র ধর্মই মানুষের সঙ্গী হয়।

-পৃথিবীর সবচেয়ে বড় বিস্ময় কী?

-প্রতিদিন মানুষ জীবজন্তুকে মৃত্যুবরণ করতে দেখে, তবুও তারা নিজেরা চিরকাল বেঁচে থাকতে চায়।

এভাবেই যক্ষ যুধিষ্ঠিরকে একের পর এক বহু প্রশ্ন করতে লাগলেন। যুধিষ্ঠির বিন্দুমাত্র দ্বিধা না করে সেগুলোর সবকটির উত্তর দিলেন। পরিশেষে যক্ষ বললেন, "তোমার উত্তর শুনে আমি অত্যন্ত প্রীত হয়েছি! তোমার ভাইদের মধ্য থেকে একজনকে বেছে নাও। আমি তাকে পুনরায় জীবিত করে দেব।"

"নকুলই জীবিত হোক," যুধিষ্ঠির বললেন।

হঠাৎ সেই পরাক্রমশালী যক্ষ এক মূর্ত রূপ ধারণ করে তাঁর সামনে এসে দাঁড়ালেন! তিনি বললেন, "ধর্মরাজ! তুমি নকুলকে কেন বেছে নিলে? তোমার ভাই ভীমের দেহে ১৬,০০০ হাতির সমান শক্তি রয়েছে! তোমার ভাই অর্জুন ধনুর্বিদ্যায় অপ্রতিদ্বন্দ্বী। তাদের বাদ দিয়ে তুমি কেন নকুলকেই বেছে নিলে?"

"কারণটি হলো এই," যুধিষ্ঠির উত্তর দিলেন। "আমার পিতার দুজন স্ত্রী ছিলেন—কুন্তী এবং মাদ্রী। আমি কুন্তীর সন্তান। আমি চাই মাদ্রীর সন্তানদের মধ্য থেকেও অন্তত একজন জীবিত থাকুক। তাই আমি নকুলের প্রাণ ভিক্ষা চাইছি।" "আমি তোমাকে নিয়ে গর্বিত, যুধিষ্ঠির! তুমি সত্যিই একজন সৎ ও মহৎ ব্যক্তি। তোমার প্রতিটি কর্মেই তুমি ধর্মকে অনুসরণ করো। তাই, আমি তোমার সকল ভাইয়ের প্রাণ ফিরিয়ে দিচ্ছি,"—এই কথা বলে যক্ষ উধাও হয়ে গেলেন।

রাজাজির মহাভারতের পুনর্কথন থেকে নির্বাচিত অংশ অবলম্বনে রচিত।

Publisher Rajalakshmi Srinivasan Memorial Foundation

P. Saraswati V. Vijayakanthi

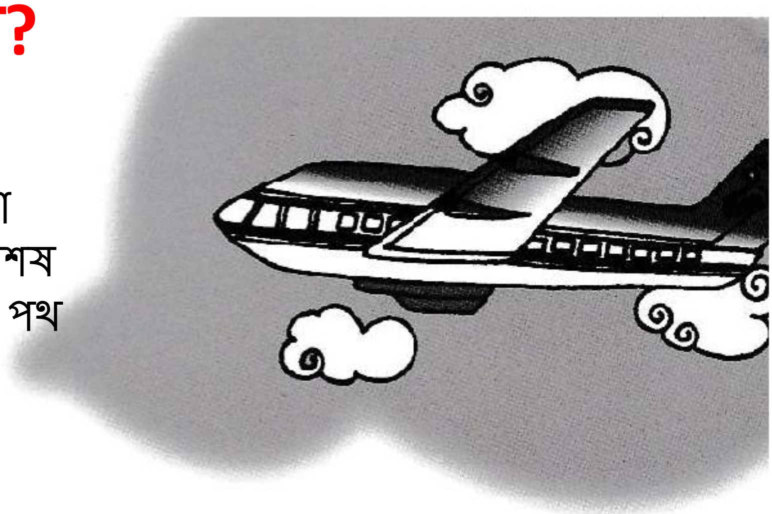
L. S. Saraswathi S. Rajalakshmi

Bengali Sriparna Tamhane

Artist Uma Krishnaswamy

আমরা কারা?

আমি মাটির ওপর আঁকা একটি রেখা
যার নেই কোনো শুরু, নেই কোনো শেষ
তবে আছে প্রবেশের ও প্রস্থানের বহু পথ



প্রতিদিন বহুবার আমি আসা-যাওয়া করি
বহু মুখ আমি দেখি, যা কেবলই বদলায়
অগণিত মানুষকে আমি তুলে নিই ও নামিয়ে দিই
আর তাদের গন্তব্যে পৌঁছাতে সাহায্য করি



আমার কোনো পাখনা নেই
আমার কোনো লেজ নেই
জলের ওপর দিয়ে আমি ভেসে চলি
আমার পালের বুকে বাতাস নিয়ে

তারা কখনোই আলাদা হয় না—তবু তারা বন্ধু নয়
তারা কখনোই মুখোমুখি হয় না—তবু তারা শত্রু নয়



বারবার পথ মাড়িয়ে
আমি তোমাকে ঘুরিয়ে নিয়ে বেড়াই
তুমি আমাকে বিশ্বস্ততার সাথে বয়ে নিয়ে চলো
চড়াই-উতরাই—সব পথেই!

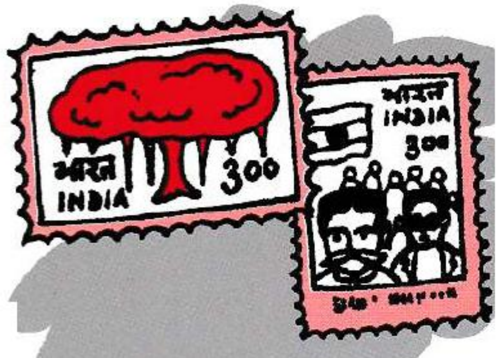


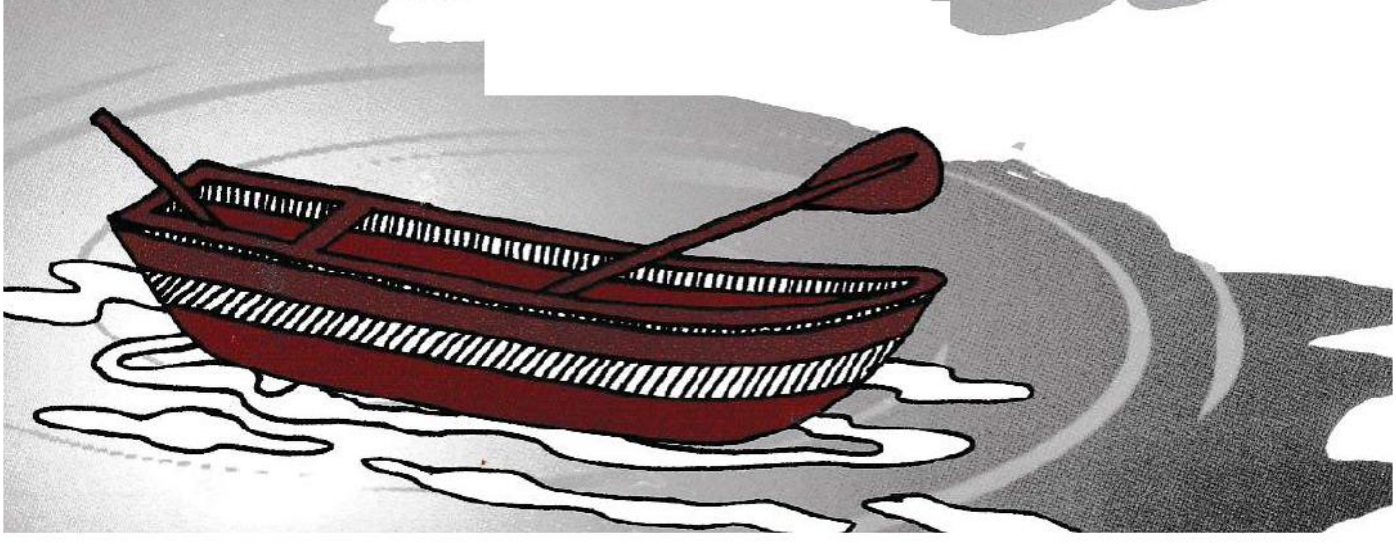
ছুটছে, ছুটছে, সশব্দে ছুটে চলেছে
দুটি রেখার ওপর দিয়ে ছুটছে—উ-উ, উ-উ!
বন-জঙ্গল, পাহাড়-নদী পেরিয়ে
থামছে এসে গ্রামের মাঝে! উ-উ, উ-উ!
হ্যালো! বিদায়! উ-উ, উ-উ!

আমাকে চালাতে হলে তোমাকে লাথি মারতে হবে!
দুটি গোল চাকা ঘুরছে অবিরাম
দুটি বলিষ্ঠ ঘাড় টানছে সামনে
আটটি লম্বা পা ফেলছে দীর্ঘ পদক্ষেপ
আর একজন সতর্ক কৃষক দিচ্ছে দিকনির্দেশনা



ওই আসছে সে, অনেক উঁচুতে
দেখো তার ডানা, কী উজ্জ্বল হয়ে জ্বলছে
ওই তার লেজ, দীর্ঘ ও ঋজু
ওই চলে গেল সে—বহুদূরে, বহুদূরে!





তোমার মনোযোগ কাড়তে আমি চিৎকার করে উঠি,
তারপর তোমার কানে কানে ফিসফিসিয়ে কথা বলি।

তুমি যা–ই বলো, আমি সবটুকু শুষে নিই,
আর যখন তুমি 'প্লে' (Play) বোতামটি চাপো,
আমি তা হুবহু ফিরিয়ে দিই।

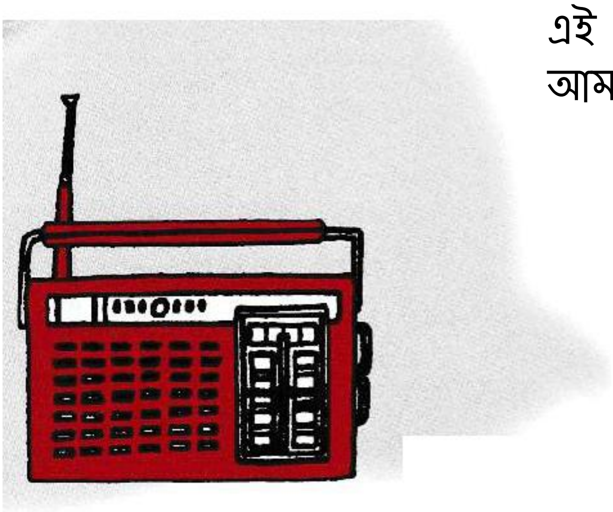


আমি আসি সুদূর পথ পাড়ি দিয়ে—
এখানে পৌঁছাতে কতই না পথ চলতে হয়েছে আমাকে!
তুমি ছুটে আসো আমার সাথে দেখা করতে,
সুসংবাদের আশায়, গভীর ব্যাকুলতা নিয়ে।

কেনা হয়ে গেলে আমি এক জায়গায় আটকে যাই,
আর আটকে যাওয়ার পর, মাড়ানো হয় আমাকে !
আমার লেজটি থাকে খাড়া—যদিও তাতে কোনো লোম নেই!
বাতাস থেকে সংকেত (Signals) ধরে এনে,
সে তোমাকে পৌঁছে দেয় পৃথিবীর সব প্রান্তের খবর।

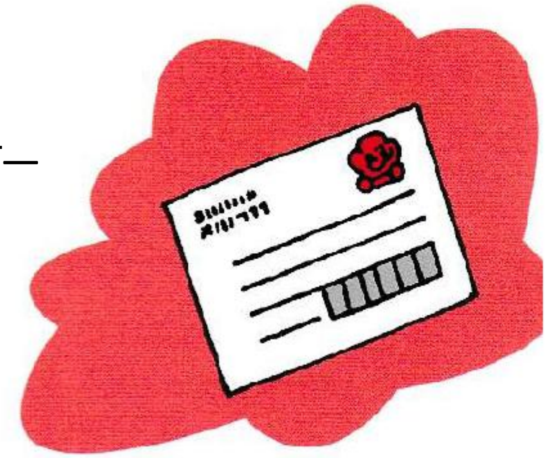


পথচলার ধুলো মেখে,
আমি এসে দাঁড়াই তোমার দুয়ারে।
তুমি আমাকে ঘরে তুলে নাও,
আর আমার বলা কথাগুলো তৃষ্ণার্তের মতো
পান করো।



এই জাদুর বাক্সের ভেতর দিয়ে,
আমরা দেখতে পাই বিশাল এই পৃথিবীটাকে!

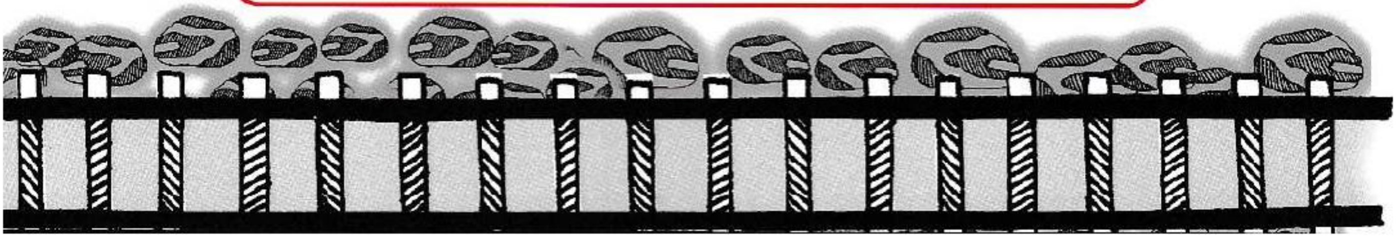
দূর-দূরান্তের সব বার্তা এসে,
মিশে যায় এই উজ্জ্বল বাক্সের মাঝে,
আর তারপর ছড়িয়ে পড়ে সবার মাঝে।



আমি এমন একটি চিঠি, যা তুমি পাঠাতে পারো—
মাত্র একটি বোতামে ক্লিক করেই।

ভোরের সূর্যের সাথে সাথেই আমি এসে হাজির হই;
আমাকে দেখে তুমি কী যে খুশি হও!
তুমি হয়তো আমাকে অন্যদের সাথে ভাগ করে নাও,
তবে তা কেবল তোমার নিজের তৃষ্ণা মেটার পরেই—
কারণ, আমার ভাণ্ডারে সবার জন্যই থাকে অফুরন্ত জোগান।

সাইকেল, বাস, গরুর গাড়ি, স্কুটার, রাস্তা, রেললাইন, নৌকা, ট্রেন,
উড়োজাহাজ, ডাকপিয়ন, ই-মেইল, টেলিভিশন, সংবাদপত্র,
ডাকবাক্স, রেডিও, টেলিফোন, চিঠি, অডিও রেকর্ডার, ডাকটিকিট।



Publisher Rajalakshmi Srinivasan Memorial Foundation

P. Saraswati V. Vijayakanthi
L. S. Saraswathi S. Rajalakshmi

Bengali Sriparna Tamhane

Artist Uma Krishnaswamy

তোত্তো-চান



একদা জাপানে একটি অসাধারণ স্কুল ছিল। তোত্তো-চান নামের এক ছোট্ট মেয়ে সেখানে পড়াশোনা করত। পরবর্তী কালে সে সেই স্কুলটি নিয়ে একটি বই লিখেছিল। সে চেয়েছিল, সবাই যেন সেই স্কুলটি সম্পর্কে জানতে পারে। তার মনে হতো, স্কুলটি তার জীবনটাই বদলে দিয়েছিল।

স্কুলটির নাম ছিল 'তোমোয়ে গাকুয়েন'। কিন্তু বইটির নাম ছিল 'তোত্তো-চান: জানালার ধারের ছোট্ট মেয়েটি'। সে তার বইটির নাম 'তোমোয়ে গাকুয়েন' না রেখে 'তোত্তো-চান' রেখেছিল কেন? আচ্ছা, আপনিই বলুন তো—আপনি প্রথমে কোন বইটি হাতে তুলে নেবেন? একটি স্কুল নিয়ে লেখা বই, নাকি জানালার ধারে বসে থাকা এক ছোট্ট মেয়েকে নিয়ে লেখা বই?

তোমোয়ে গাকুয়েন স্কুলের গেটের খুঁটি হিসেবে ব্যবহৃত হতো দুটি চারাগাছ। ভাবুন তো একবার—গেটের খুঁটিতে রয়েছে শিকড় আর পাতা! স্কুলের মাঠের চারপাশে কোনো দেয়াল ছিল না। তার বদলে ছিল শুধুই গাছপালা! সারি সারি গাছ, আর তাদের পাশেই ফুলের বাগিচা ।

এমন এক সীমানার ভেতরে অবস্থিত শ্রেণিকক্ষগুলোও কি তবে বিশেষ কিছু ছিল না? অবশ্যই ছিল! তোমোয়ে গাকুয়েন স্কুলের সবকটি শ্রেণিকক্ষই ছিল আসলে পুরনো রেলগাড়ির বগি। সেখানে মোট ছয়টি বগি ছিল—প্রতিটি ক্লাসের জন্য একটি করে। এই বগিগুলোকে ভালোভাবে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করে নতুন করে রং করা হয়েছিল। দেখে মনে হতো, যেন এখনই চলতে শুরু করবে! কিন্তু বগিগুলোর ভেতরে নতুন করে ডেস্ক, চেয়ার আর ব্ল্যাকবোর্ড সাজিয়ে নেওয়া হয়েছিল।

তোত্তো-চান তার শ্রেণিকক্ষের জানালার ধারে বসে বাইরে তাকিয়ে থাকতে পারত। সে কল্পনা করত, যেন ট্রেনটি ছুটে চলেছে। জানালার সামনে দিয়ে দ্রুত সরে যাচ্ছে নানা রকম দৃশ্যপট। তবে সে খুব একটা এমনটা করত না—আর তার কারণটি ছিল বেশ অদ্ভুত: সে তার পড়াশোনার কোনো অংশই বাদ দিতে চাইত না!

তোমোয়ে গাকুয়েন স্কুলের পড়াশোনার পদ্ধতি ছিল বেশ আনন্দদায়ক! প্রথমে শিক্ষকরা ব্ল্যাকবোর্ডে আলোচনার বিষয়গুলোর একটি তালিকা লিখে দিতেন। এরপর শিক্ষার্থীরা নিজেরাই বেছে নিত যে, তারা কোনটি নিয়ে পড়াশোনা করবে।



তোত্তো-চানের প্রথম শ্রেণীর ক্লাসে প্রতিটি শিশু ভিন্ন ভিন্ন কাজ করত। কেউ কেউ বর্ণমালা লেখার অনুশীলন করত। একটি মেয়েকে সব সময়ই দেখা যেত বই পড়তে। অন্য শিশুরা ছবি আঁকত। কেউ কেউ তো আবার শরীরচর্চাও করত। তারা সবাই গভীর মনোযোগের সাথে নিজেদের কাজ করত। তোত্তো-চানের স্কুলে কেউ কখনোই একঘেয়েমিতে ভুগত না!

মাঝে মাঝে স্কুলের সীমানার বাইরেও নানা ধরনের কার্যক্রম চলত। শিক্ষকরা প্রায়ই শিক্ষার্থীদের নিয়ে দলবেঁধে হাঁটতে বের হতেন। হাঁটার পথের পাশ দিয়েই বয়ে গিয়েছিল কলকল ধ্বনি তোলা একটি ছোট নদী। চেরিগাছের ছায়ায় ঢাকা ছিল সেই পথটি। পথটি গিয়ে মিশেছিল কাছেই অবস্থিত একটি মন্দিরের আঙিনায়। মন্দির প্রাঙ্গণে শিক্ষার্থীরা পুকুরটির চারপাশে ঘুরে বেড়াত। সেখানে পড়ে থাকা ছোট ছোট কালো নুড়িপাথর দিয়ে তারা 'হপ-স্কচ' (এক-পায়ে লাফিয়ে খেলার একটি খেলা) খেলত। বিশাল বিশাল মূর্তিগুলোর দিকে তারা বিস্ময়ভরে তাকিয়ে থাকত। শিক্ষক তাদের ততক্ষণ খেলতে দিতেন, যতক্ষণ না তারা ক্লান্ত হয়ে পড়ত। দলবেঁধে বাইরে ঘুরতে যাওয়াটা তোত্তো-চানের কাছে সব সময়ই ছিল সবচেয়ে প্রিয়!



মাঝে মাঝে পুরো স্কুলের শিক্ষার্থীরা মিলে অডিটোরিয়ামের ভেতরে তাঁবু খাটাত। সেখানেই তারা রাত কাটাত। স্কুলের মোট পঞ্চাশজন শিক্ষার্থীর প্রায় সবাই-ই এই ধরনের রাত্রিযাপনের আয়োজনে অংশ নিতে আসত।

একদিন প্রধান শিক্ষক শিক্ষার্থীদের বললেন, "আমি তোমাদের একটি পরীক্ষা নেব। এটি হবে সাহসিকতার পরীক্ষা। তোমাদের মধ্যে কেউ কেউ ভূতের ভূমিকা পালন করবে। তোমরা মন্দিরের প্রাঙ্গণে লুকিয়ে থাকবে। আর বাকিরা সেই 'ভূতদের' খুঁজে বের করতে যাবে।"

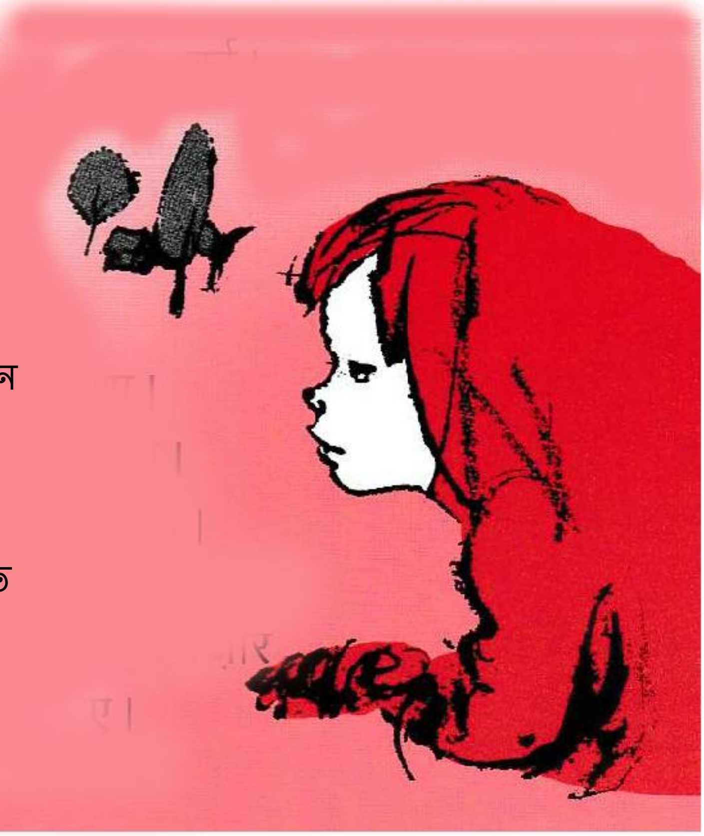
"কে কে ভূত হতে চাও?" তিনি জানতে চাইলেন। সাতজন শিশু হাত তুলল।

পরীক্ষার দিনটি এল। সন্ধ্যায় শিশুরা অডিটোরিয়ামে তাদের তাঁবু খাটিয়ে নিল। 'ভূত' সাজার দলের শিশুরা ভূতের পোশাক পরে সেজেগুজে তৈরি হলো। তারা মন্দিরের প্রাঙ্গণে গেল, যাতে লুকিয়ে থাকার মতো উপযুক্ত জায়গা খুঁজে নিতে পারে।

যাওয়ার পথে তারা অন্য শিক্ষার্থীদের দিকে তাকিয়ে মুখভঙ্গি করে ভয় দেখাল। "আমরা কিন্তু তোমাদের সত্যিই খুব ভয় পাইয়ে দেব!" তারা বলল। এবার বাকি শিক্ষার্থীরা নিজেদের মধ্যে কয়েকটি দলে ভাগ হয়ে গেল। তারা 'রক, পেপার, সিজারস' খেলার মাধ্যমে এই দলগুলি তৈরী করল। তোত্তো-চান পাঁচজনের একটি দলে পড়ল।

শিক্ষক সেই 'ভূত-সন্ধানীদের' বললেন, "তোমরা যদি পুরো পরীক্ষাটি শেষ করতে না-ও পারো, তাতে কোনো সমস্যা নেই। তখন আর সবার মতোই তোমরা স্কুলে ফিরে চলে এসো।" (তোমোয়ে গাকুয়েন স্কুলের অন্যতম সেরা একটি বৈশিষ্ট্য ছিল এই যে—কোনো পরীক্ষায় উত্তীর্ণ না হওয়ার জন্য শিক্ষার্থীদের কখনোই শাস্তি দেওয়া হতো না!)

সময় হয়ে এল। তারা রওনা হওয়ার জন্য প্রস্তুত। দলগুলো সেই 'ভূতদের' খোঁজে বেরিয়ে পড়ল। তোত্তো-চানের দলটি ধীরগতিতে হাঁটছিল। চারপাশ তখন নিকষ অন্ধকারে ছেয়ে গেছে। কোনো কোনো শিশু ভয়ে থরথর করে কাঁপছিল; তাদের কাঁপুনি থামছিলই না। গাছের পাতার ফাঁকে যখন বাতাস শোঁ-শোঁ করে বয়ে গেল, তখন তারা ভয়ে আর্তনাদ করে উঠল—"উউউহ!" চলার পথে তাদের পা ফসকে গেলে বা তারা হোঁচট খেলে, তারা ভাবত—"নিশ্চয়ই কোনো ভূত আমাকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিয়েছে!" যদি কোনো বন্ধু তাদের হাত ধরে ফেলত, তবে তারা সজোরে হাতটি সরিয়ে নিত। তারা মনে মনে ভাবত—"এ নিশ্চয়ই কোনো ভূতের হাত!"

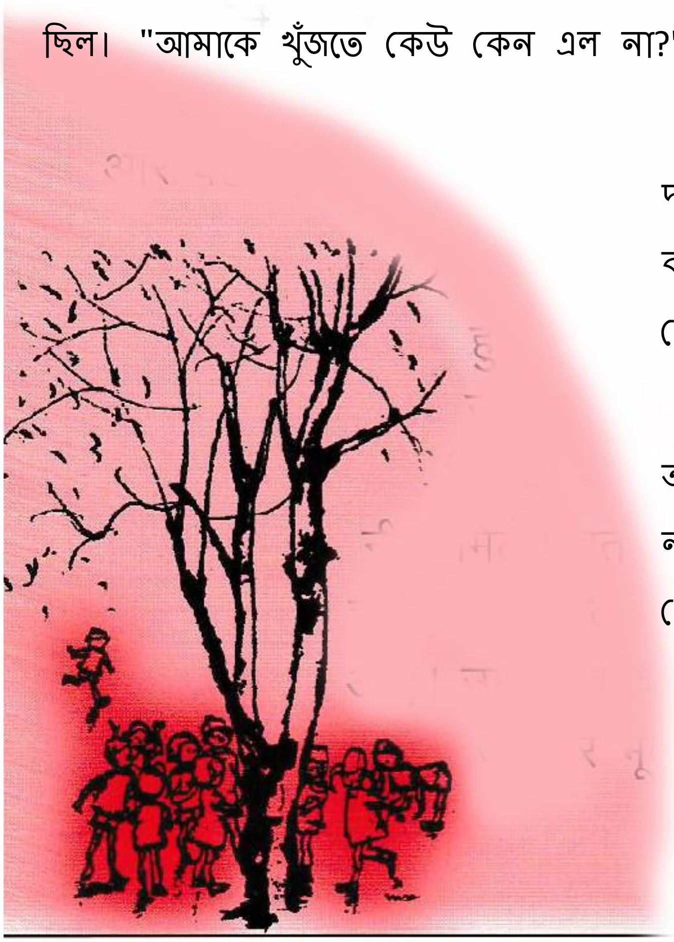


শীঘ্রই সবারই আর ধৈর্য রইল না। তোত্তো-চান তার দলের সবাইকে নিয়ে দৌড়ে স্কুলে ফিরে এল। অন্য দলগুলোও ঠিক তাদের পিছু পিছু এল! আর আরও অনেক দল তো আগেই সেখানে পৌঁছে গিয়েছিল! আচ্ছা, কোনো শিশু কি আদৌ সেই "ভূতদের" খুঁজতে গিয়েছিল?

কিছুক্ষণ পর, সেই "ভূতদের" একজন দৌড়ে এল। সে ছিল একটি ছোট ছেলে। সে কাঁদছিল। তাকে খুঁজতে কেউ-ই আসেনি। তাই সে ভয় পেয়ে গিয়েছিল। একজন শিক্ষক তাকে মন্দিরের কাছে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে স্কুলে ফিরিয়ে আনলেন।

ঠিক তখনই আরও একটি "ভূত" কাঁদতে কাঁদতে দৌড়ে এল। তার সাথে ছিল একজন "ভূত-সন্ধানী "। আর সেই সন্ধানী ও কাঁদছিল! সেই "ভূতটি" টের পেয়েছিল যে একজন ভূত-সন্ধানী তার দিকেই আসছে। তাই তাকে ভয় দেখানোর জন্য সে হঠাৎ ঝোপের আড়াল থেকে লাফ দিয়ে বেরিয়ে এসেছিল। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত, দুজনে একে অপরের সাথে সজোরে ধাক্কা খেল! দুজনেই ভীষণ ভয় পেয়ে গিয়েছিল! এই ঘটনাটি শোনার পর বাকি সব শিশু হো হো করে হেসে উঠল। শীঘ্রই সেই "ভূতগুলোও" তাদের সাথে হাসিতে যোগ দিল।

সবশেষে এল খবরের কাগজ দিয়ে তৈরি পোশাক পরা একটি "ভূত"। সে ভীষণ রেগে ছিল। "আমাকে খুঁজতে কেউ কেন এল না?" সে জানতে চাইল।



শিশুটির হাত-পা জুড়ে ছিল মশার কামড়ের দাগ। "দেখো!" শিশুরা হেসে উঠল। "এ তো মশার কামড় খাওয়া ভূত!" বেচারা সেই "ভূতটিও" শেষমেশ তাদের সাথে না হেসে পারল না।

সেই দিন থেকে, তোত্তো-চান কিংবা তার স্কুলের অন্য কোনো সহপাঠী—কেউই আর ভূতকে ভয় পেত না। কারণ, দিনশেষে দেখা গেল—ভূতরাও তো ভয় পেতে পারে!

তেৎসুকো কুরোয়ানাগির স্মৃতিকথার ডরোথি ব্রিটনের করা অনুবাদ অবলম্বনে রচিত।

চিত্রশিল্পী: চিহোরো ইওয়াসাকি

Publisher Rajalakshmi Srinivasan Memorial Foundation

P. Saraswati V. Vijayakanthi

L. S. Saraswathi S. Rajalakshmi

Bengali Sriparna Tamhane

Artist Uma Krishnaswamy

স্মৃতিচারণ

প্রিয় মঞ্জু,

আমি এইমাত্র গান্ধীজির আত্মজীবনী—'আমার সত্য অন্বেষণের কাহিনী' (The Story of My Experiments With Truth)—পড়া শেষ করলাম। বইটি অত্যন্ত রোমাঞ্চকর!

বইটিতে গান্ধীজির জীবনের প্রারম্ভিক সময়ের নানা ঘটনার কথা বলা হয়েছে—সেই সময়কার কথা, যা আমরা স্কুলে পড়া 'লবণ সত্যাগ্রহ' বা 'ভারত ছাড়ো আন্দোলন'-এরও আগের ঘটনা। এই বইটি পড়ে আমি গান্ধীজির জীবন সম্পর্কে অনেক কিছু জানতে পেরেছি।

তাঁর শৈশবকালটি ছিল বেশ আকর্ষণীয়! জীবনের প্রতিটি অভিজ্ঞতাই তাঁর মনে গভীর ছাপ ফেলেছিল। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, তাঁর বয়স যখন আনুমানিক বারো বছর, তখন তিনি 'শ্রবণ'-কে নিয়ে লেখা একটি বই পড়েছিলেন। তুমি কি শ্রবণের কথা শুনেছ? তাঁর বাবা-মা ছিলেন দৃষ্টিহীন। জীবনের প্রতিটি প্রয়োজনে তাঁরা শ্রবণের ওপরই নির্ভর করতেন। আর শ্রবণও তাঁদের সেবাযত্ন ও মঙ্গলের জন্য নিজেকে পুরোপুরি উৎসর্গ করেছিলেন। কিশোর গান্ধীজি শ্রবণের জীবনকাহিনি নিয়ে তৈরি একটি চিত্রপ্রদর্শনও দেখেছিলেন। সেই চিত্রাবলিতে দেখা গিয়েছিল, শ্রবণ একটি কাঠের বাঁকের দুই প্রান্তে ঝোলানো দুটি ঝুড়ির মধ্যে তাঁর বাবা-মাকে বসিয়ে, সেই বাঁকটি নিজের কাঁধে বহন করে নিয়ে চলেছেন!

শ্রবণের এই কাহিনি গান্ধীজির মনে গভীর আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। তিনি সংকল্প করলেন যে, শ্রবণের মতোই গভীর ভালোবাসা দিয়ে তিনিও তাঁর বাবা-মায়ের সেবায় নিজেকে নিয়োজিত করবেন।



গান্ধীজির মনে গভীর প্রভাব বিস্তারকারী আরেকটি কাহিনি হলো রাজা হরিশ্চন্দ্রের উপাখ্যান। বাবার অনুমতি নিয়ে তিনি হরিশ্চন্দ্রের জীবনভিত্তিক একটি নাটক দেখতে গিয়েছিলেন। গান্ধীজি বারবার সেই নাটকটি দেখতে যেতেন। একবারের জন্যও তিনি বিন্দুমাত্র একঘেয়েমি বোধ করেননি! সেই নাটকের দৃশ্যগুলো তাঁর মনের গভীরে গেঁথে গিয়েছিল। তিনি সর্বদা সেই দৃশ্যগুলো নিয়েই ভাবতেন।

হরিশ্চন্দ্রকে কতই না দুঃখ-কষ্ট সহ্য করতে হয়েছিল! তাঁর পুরো পরিবারকেই দাস হিসেবে বিক্রি করে দেওয়া হয়েছিল! তবুও তিনি তাঁর দেওয়া কথা বা প্রতিজ্ঞা থেকে একচুলও সরে আসেননি। গান্ধীজি ঠিক তাঁর মতোই হতে চেয়েছিলেন। তিনি মনে মনে ভাবতেন, "হরিশ্চন্দ্রের মতো সত্যবাদী কেন সবাই হতে পারে না?" এই প্রশ্নটি দিন-রাত তাঁর মনকে আচ্ছন্ন করে রাখত।

গান্ধীজি তাঁর বইতে উল্লেখ করেছেন যে, তাঁর জীবনের শেষ পর্যায়ে এসেও হরিশ্চন্দ্র এবং শ্রবণ—উভয়েই তাঁর কাছে ছিলেন রক্তমাংসের গড়া জীবন্ত ও বাস্তব মানুষ।

গান্ধীজি তাঁর বইতে স্কুলের দিনগুলোর আরেকটি ঘটনার কথাও উল্লেখ করেছেন। তবে এই ঘটনাটি ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকৃতির। তিনি এমন কিছু কাজ করেছিলেন, যার জন্য পরবর্তীকালে তাঁকে গভীর অনুশোচনা করতে হয়েছিল।

হাইস্কুলে পড়ার সময় গান্ধীজির এমন একজন বিশেষ বন্ধু ছিল, যাকে অন্য কেউ পছন্দ করত না। সবাই গান্ধীজিকে পরামর্শ দিত সেই বন্ধুর সঙ্গ এড়িয়ে চলতে। তারা বলত, "এই ছেলেটি বিপথে চলে গেছে বা নষ্ট হয়ে গেছে।" কিন্তু গান্ধীজি সেসব কথায় বিন্দুমাত্র কর্ণপাত করতেন না। তিনি কারও কথাই শুনতেন না।

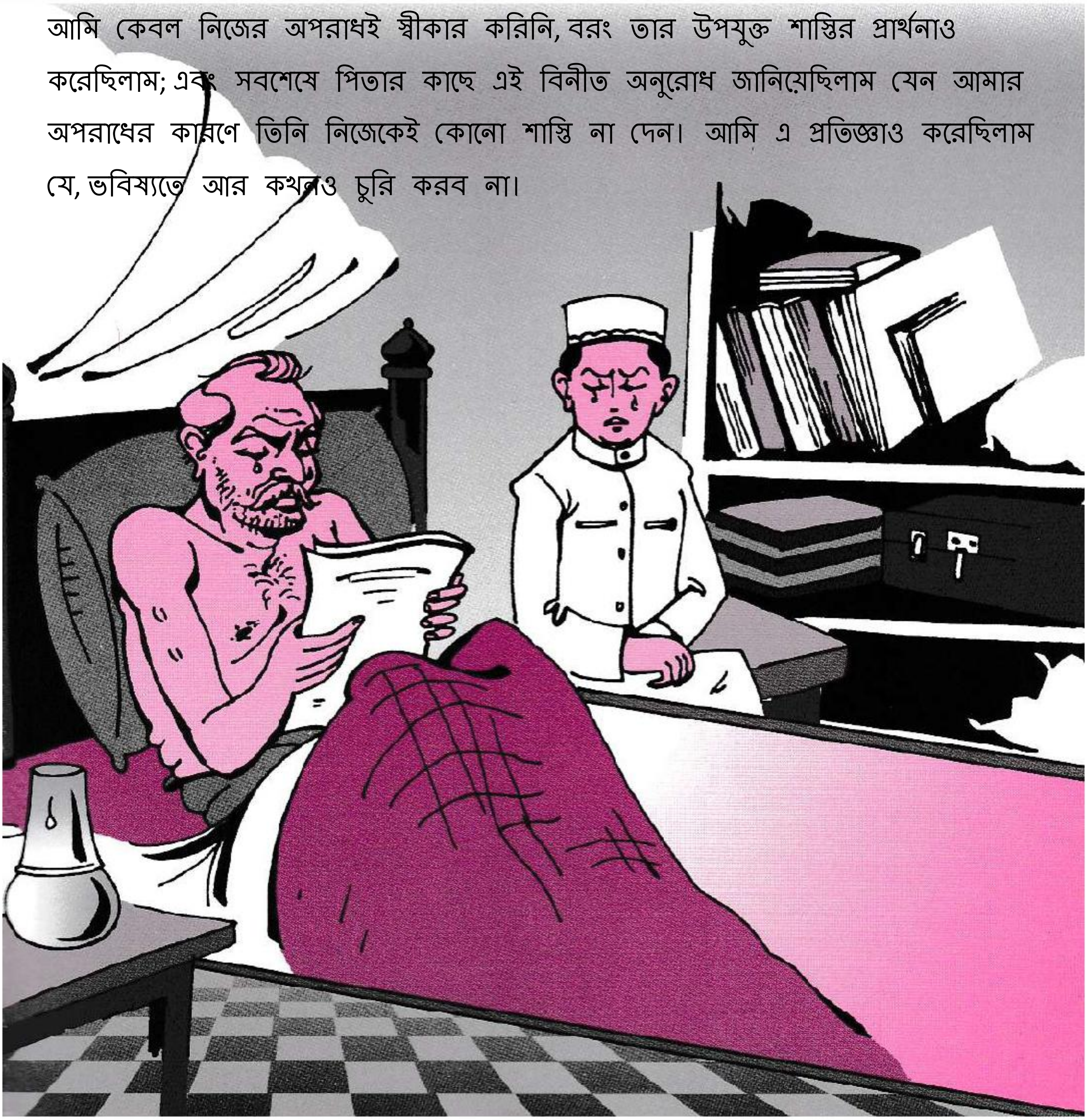
ধীরে ধীরে, কিন্তু নিশ্চিতভাবেই, সেই বন্ধুটি গান্ধীজির ওপর এক গভীর ও প্রবল প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হলো। তাঁর মনের গতিপথ বদলাতে শুরু করল। যখন সেই দুই বালক একসঙ্গে থাকত, তখন তারা কিছু নিষিদ্ধ কাজে লিপ্ত হওয়ার চেষ্টা করত। তারা সিগারেট টানত, এবং এ জাতীয় আরও অনেক কিছু করত।

এমনকি এই বন্ধুত্বের অবসান ঘটার পরেও, গান্ধীজি এমন সব কাজ চালিয়ে গেলেন যা তিনি নিজেও জানতেন যে ভুল। তিনি তো টাকাও চুরি করেছিলেন!

কিন্তু অবশেষে তাঁর বিবেক বিদ্রোহ করে উঠল। এই সময়ের একেবারে শেষভাগে তাঁর মনে যে প্রবল মানসিক আলোড়ন সৃষ্টি হয়েছিল, গান্ধীজি তার বর্ণনা দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, সেই মানসিক যন্ত্রণা তাঁর সহ্যের সীমা ছাড়িয়ে গিয়েছিল। তিনি দৃঢ় সংকল্প করলেন যে, আর কখনও চুরি করবেন না। এবং তিনি সিদ্ধান্ত নিলেন যে, পিতার কাছে নিজের অপরাধ স্বীকার করবেন। তাঁর নিজের ভাষাতেই সেই কথাগুলো নিচে দেওয়া হলো:

...আমি মুখ ফুটে কিছু বলার সাহস পাচ্ছিলাম না...। আমি ভয় পাচ্ছিলাম এই ভেবে যে, আমার অপরাধের কথা জানলে পিতাকে হয়তো ভীষণ মানসিক কষ্ট পেতে হবে। কিন্তু আমার মনে হলো, এই ঝুঁকিটুকু নেওয়া প্রয়োজন; কারণ অপরাধ স্বীকার না করলে মনের কলুষতা দূর করা সম্ভব নয়।

অবশেষে আমি সিদ্ধান্ত নিলাম যে, নিজের অপরাধের কথা লিখে ফেলব, সেই স্বীকারোক্তি পিতার হাতে তুলে দেব এবং তাঁর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করব। আমি কাগজের একটি টুকরোয় সেই কথাগুলো লিখলাম এবং স্বয়ং পিতার হাতে তা তুলে দিলাম। সেই চিঠিতে আমি কেবল নিজের অপরাধই স্বীকার করিনি, বরং তার উপযুক্ত শাস্তির প্রার্থনাও করেছিলাম; এবং সবশেষে পিতার কাছে এই বিনীত অনুরোধ জানিয়েছিলাম যেন আমার অপরাধের কারণে তিনি নিজেকেই কোনো শাস্তি না দেন। আমি এ প্রতিজ্ঞাও করেছিলাম যে, ভবিষ্যতে আর কখনও চুরি করব না।



পিতার হাতে সেই স্বীকারোক্তি তুলে দেওয়ার সময় আমি থরথর করে কাঁপছিলাম। তখন তিনি 'ফিসচুলা' (ভগন্দর) রোগে ভুগছিলেন এবং শয্যাশায়ী ছিলেন। তাঁর বিছানা বলতে ছিল কেবল একটি সাধারণ কাঠের তক্তা। আমি তাঁর হাতে সেই চিঠিটি তুলে দিলাম এবং তক্তাটির ঠিক উল্টো দিকে বসে পড়লাম।

তিনি পুরো চিঠিটি পড়ে শেষ করলেন; আর ঠিক তখনই তাঁর গাল বেয়ে মুক্তার মতো স্বচ্ছ অশ্রুবিন্দু গড়িয়ে পড়ল, যা কাগজের টুকরোটিকে ভিজিয়ে দিল। মুহূর্তের জন্য তিনি গভীর চিন্তায় মগ্ন হয়ে চোখ বুজলেন, আর তারপর সেই চিঠিটি ছিঁড়ে ফেললেন। চিঠিটি পড়ার জন্য তিনি উঠে বসেছিলেন; পড়া শেষে তিনি পুনরায় শুয়ে পড়লেন। আমিও কেঁদে ফেললাম। আমি আমার পিতার অন্তরের সেই গভীর যন্ত্রণা যেন নিজের চোখে দেখতে পাচ্ছিলাম। আমি যদি একজন চিত্রশিল্পী হতাম, তবে আজ আমি সেই পুরো দৃশ্যটির একটি ছবি এঁকে ফেলতে পারতাম। দৃশ্যটি আজও আমার স্মৃতিতে এতটাই জীবন্ত হয়ে আছে।

ভালোবাসার সেই মুক্তার মতো অশ্রুবিন্দু আমার হৃদয়কে কলুষমুক্ত করেছিল এবং আমার সমস্ত পাপ ধুয়ে মুছে সাফ করে দিয়েছিল। একমাত্র সেই ব্যক্তিই বুঝতে পারবেন এই ভালোবাসার স্বরূপ কী, যিনি নিজে কখনও এমন ভালোবাসার অভিজ্ঞতা লাভ করেছেন।

আমার কাছে এটি ছিল 'অহিংসা'-র এক পরম শিক্ষা। সেই সময়ে আমি এর মধ্যে পিতার ভালোবাসা ছাড়া আর কিছুই দেখতে পাইনি; কিন্তু আজ আমি জানি যে, তা ছিল বিশুদ্ধ 'অহিংসা'। যখন এই 'অহিংসা' সর্বব্যাপী হয়ে ওঠে, তখন তা যারই সংস্পর্শে আসে—সবকিছুকেই রূপান্তরিত করে দেয়। এর শক্তির কোনো সীমা নেই।

Publisher Rajalakshmi Srinivasan Memorial Foundation

P. Saraswati V. Vijayakanthi

L. S. Saraswathi S. Rajalakshmi

Bengali Sriparna Tamhane

Artist Uma Krishnaswamy

বিক্রমাদিত্যের সিংহাসন

প্রাচীনকালে উজ্জয়িনী ছিল ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নগরী। বহু জ্ঞানী-গুণী ও কবি সেখানে সমবেত হতেন। স্বয়ং মহাকবি কালিদাসও একসময় উজ্জয়িনীতে অবস্থান করেছিলেন। এটি ছিল বিক্রমাদিত্যের রাজত্বকাল। সে ছিল এক গৌরবোজ্জ্বল যুগ!

বিক্রমাদিত্য একজন শক্তিশালী ও গুণবান রাজা হিসেবে দেশ-বিদেশে সুপরিচিত ছিলেন। প্রজাদের প্রতি তাঁর অসীম করুণা ও সহমর্মিতার কারণে তাঁর প্রজারা তাঁকে খুব ভালোবাসত। তবে যে গুণটি বিক্রমাদিত্যকে চিরস্থায়ী খ্যাতি এনে দিয়েছিল, তা হলো তাঁর বিচক্ষণ বিচারবুদ্ধি। যখনই তিনি কোনো বিবাদের মীমাংসা করতেন, উভয় পক্ষই সন্তুষ্টচিত্তে ফিরে যেত। তাদের পারস্পরিক তিক্ততা প্রশমিত হতো এবং তারা নিশ্চিত হতো যে, প্রকৃত ন্যায়বিচারই প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

বহু বছর ধরে বিক্রমাদিত্যের রাজ্যে সমৃদ্ধি বিরাজমান ছিল। কিন্তু হায়! কালের অমোঘ নিয়মের কাছে উজ্জয়িনীও হার মানল। কালক্রমে সেই নগরীর সুউচ্চ অট্টালিকা ও মিনারগুলো ধূলিসাৎ হয়ে গেল। সর্বত্রই অবাধে গজিয়ে উঠল ঘাস ও ঝোপঝাড়। বিক্রমাদিত্য নিজে বেঁচে রইলেন কেবল অন্যান্য রাজাদের স্মৃতিতে, লোকগাথাগুলোতে, এবং নবজাত পুত্রসন্তানদের নাম হিসেবে।

তবে রাজা ভোজের সুশাসনের যুগে তাঁর স্মৃতি পুনরায় জীবন্ত হয়ে উঠল। ঘটনাটি ঘটেছিল এই রকম :





একদা একদল রাখাল বালক একটি মাঠে খেলা করছিল। সেই মাঠে ছড়িয়ে ছিটিয়ে ছিল প্রচুর পাথরখণ্ড ও মাটির ঢিবি।

বালকেরা কখনো ঢিবিগুলোর ওপর চড়ে বসত, আবার কখনো পাথরখণ্ডগুলোর আড়ালে 'লুকোচুরি' খেলত।

ঢিবিগুলোর মধ্যে একটি ছিল বাকি সবগুলোর চেয়ে উঁচু। সেটি ছিল ফুলে ও কোমল সবুজ ঘাসে আবৃত—যেন কোনো রাজার সিংহাসন! একটি বালক দৌড়ে সেই ঢিবির চূড়ায় উঠল এবং সেখানে বসে পড়ল। খেলার ছলে সে তার বন্ধুদের বলল, "আমি এখন বিচারক! তোমরা তোমাদের সব বিবাদ বা নালিশ আমার কাছে নিয়ে এসো!"

অন্যান্য বালকেরা এতে বেশ আনন্দ পেল। তারা সবাই মিলে পরামর্শ করে একটি কাল্পনিক মামলার বিষয়বস্তু ঠিক করে নিল। বালকদের মধ্যে দুজন সেই ঢিবির সামনে এসে দাঁড়াল। তাদের একজন বলল, "হে পরম শ্রদ্ধেয় বিচারক! আমার প্রতিবেশী এবং আমি আমাদের জমির সীমানা নিয়ে একমত হতে পারছি না। দয়া করে আপনি আমাদের এই বিবাদের মীমাংসা করে দিন।"

হঠাৎ করেই ঢিবির ওপর বসে থাকা সেই বালকটির মধ্যে এক বিস্ময়কর পরিবর্তন এল! তার চালচলন ও কণ্ঠস্বর শুনে মনে হচ্ছিল, সে যেন সত্যিই একজন বিচারক। এবং সে অত্যন্ত ন্যায়সঙ্গত একটি রায় প্রদান করল।

কী চমৎকার এক খেলা! বালকেরা একে একে তাদের বন্ধুর কাছে আরও অনেক বিবাদের মীমাংসার জন্য এল। সেই বিবাদগুলোর মীমাংসা করার সময় বালকটি এমনভাবে কথা বলছিল, যেন সে বহু বছরের অভিজ্ঞতা ও প্রজ্ঞায় ঋদ্ধ একজন জ্ঞানী ব্যক্তি। সবাই তার বিচারবুদ্ধি দেখে মুগ্ধ হয়ে গেল। বাড়ি ফিরে যাওয়ার সময় না হওয়া পর্যন্ত তারা সেই নতুন খেলাটি খেলেই চলল। এবার বিচারক তাঁর বিচারাসন থেকে নিচে নেমে এলেন। তিনি আবার সেই ছোট্ট বালকটিতে পরিণত হলেন। তিনি তাঁর বন্ধুদের সাথে হাসাহাসি ও ঠাট্টা-তামাশায় মেতে উঠলেন। দিনের শেষে যেমনটা হয়, ঠিক সেভাবেই তারা একে অপরের কাছ থেকে বিদায় নিল। কিন্তু দিনটি তো মোটেও কোনো সাধারণ দিন ছিল না!

সেই ঘটনার পর থেকে, তাদের নিজেদের মধ্যে যদি কখনো কোনো প্রকৃত বিবাদ দেখা দিত, তবে শিশুরা সেই বালকটিকেই তা মিটিয়ে দেওয়ার অনুরোধ করত। তারা সেই নির্দিষ্ট স্থানে যেত, আর বালকটি সেখানে বসে একটি ন্যায়সংগত রায় প্রদান করত।

এই অলৌকিক ঘটনার কথা চারদিকে ছড়িয়ে পড়ল। মানুষজন তাদের বিবাদ-বিসংবাদ নিয়ে সেই বালকটির কাছে আসতে শুরু করল। সে সেই মাটির ঢিবির ওপর বসে প্রতিটি মামলার সমাধান করে দিত। বিবাদমান পক্ষগুলো সর্বদা সন্তুষ্টচিত্তে সেখান থেকে ফিরে যেত।

এই সব কথা শীঘ্রই রাজা ভোজের কানে পৌঁছাল। তিনি সঙ্গে সঙ্গে সত্যটা অনুমান করলেন: "ঐ বালকটি নিশ্চয়ই বিক্রমাদিত্যের সিংহাসনে বসে আছে!" তিনি তাঁর লোকদের ঢিবিটি খুঁড়তে পাঠালেন। সত্যিই, তারা একটি সিংহাসন খুঁজে পেল। তার পাদদেশে উড়তে উদ্যত ডানাবিশিষ্ট ২৫ জন দেবীর মূর্তি খোদাই করা ছিল।

রাজা ভাবলেন, "যদি আমি এই সিংহাসনে বসি, তবে নিশ্চয়ই বিক্রমাদিত্যের কৃপা আমার উপর বর্ষিত হবে। আমি সমস্ত বিবাদের বিচক্ষণতার সাথে বিচার করব এবং আমার রায়ে ন্যায়পরায়ণ ও দয়ালু হব।"

সিংহাসনটি শহরে আনা হলো। একটি দীর্ঘ শোভাযাত্রা সেটিকে রাজপ্রাসাদে নিয়ে গেল। বাদক, গায়ক এবং নর্তকীরা এর সঙ্গে ছিল। বিক্রমাদিত্যের অলৌকিক বিচারাসনটির এক ঝলক দেখার জন্য লোকেরা ভিড় জমাল।

সেদিনটি ছিল এক শুভ দিন। উচ্চপদস্থ অতিথিরা উপস্থিত ছিলেন। সকলের দৃষ্টি রাজার উপর নিবদ্ধ ছিল, তিনি সিংহাসনের দিকে এগিয়ে গেলেন।

ঠিক তখনই, খোদাই করা দেবীদের মধ্যে একজন উচ্চস্বরে বলে উঠলেন। "থামো!" তিনি বললেন। বিক্রমাদিত্যের সিংহাসনে বসার আগে ভালোভাবে চিন্তা করো। তুমি কি এই সম্মানের যোগ্য?

রাজা দ্বিধা করলেন।

দেবী জিজ্ঞাসা করলেন, “তুমি কি অন্য কোনো রাজার রাজ্য অধিকার করার আকাঙ্ক্ষা করেছ?”

“হ্যাঁ, করেছি,” রাজা বললেন। “আমি দেখতে পাচ্ছি যে আমি যোগ্য নই।”





"তিন দিন অপেক্ষা করো," দেবী বললেন। "এই দিনগুলো উপবাস ও ধ্যান করে কাটাও। তারপর আবার চেষ্টা করো।"

তিনি তাঁর খোদাই করা ডানা মেলে উড়ে গেলেন।

তিন দিন ধ্যান ও উপবাসের পর রাজা আবার সিংহাসনে বসতে গেলেন। খোদাই করা দেবীদের মধ্যে আরেকজন তাঁকে থামতে আদেশ দিলেন। "তুমি কি বিক্রমাদিত্যের সিংহাসনে আরোহণের যোগ্য?" রাজা আবার দ্বিধা করলেন।

"তুমি কি অন্য কোনো মানুষের সম্পদ অধিকার করার আকাঙ্ক্ষা করেছ?" দেবী জিজ্ঞাসা করলেন। "হ্যাঁ, করেছি," তিনি বললেন। "আমি দেখতে পাচ্ছি যে আমি যোগ্য নই।"

"তিন দিন অপেক্ষা করো," দেবী বললেন। "এই দিনগুলো উপবাস ও ধ্যান করে কাটাও। তারপর আবার চেষ্টা করো।" তিনি উড়ে গেলেন।

এভাবেই প্রায় একশো দিন কেটে গেল! এখন শুধু একটি খোদাই করা দেবী অবশিষ্ট রইলেন। তিনি রাজাকে জিজ্ঞাসা করলেন, "আপনার মন কি একটি শিশুর মনের মতো?"

"না, তা নয়," তিনি উত্তর দিলেন।

এ কথা শুনে দেবী সিংহাসনটি তুলে নিয়ে আকাশে উড়ে গেলেন। বিক্রমাদিত্যের সিংহাসনকে মানুষের চোখে সেটাই শেষবার দেখা।

ভালো রাজা ভোজ প্রায়ই বিক্রমাদিত্যের সিংহাসনের এই রহস্য নিয়ে ভাবতেন। এমন কী করে হয় যে একজন সামান্য রাখাল সিংহাসনে আরোহণ করতে পারে, কিন্তু একজন রাজা পারেন না? অবশেষে তিনি বুঝতে পারলেন:

কেবলমাত্র যার হৃদয় পবিত্র, যার মন শিশুর মতো নির্মল, সেই সিংহাসনের প্রকৃত অধিকারী হতে পারে। আর কেবল এমন ব্যক্তিই বিক্রমাদিত্যের সিংহাসনে বসতে পারে।

সিস্টার নিবেদিতার একটি গল্প অবলম্বনে

Publisher Rajalakshmi Srinivasan Memorial Foundation

P. Saraswati   V. Vijayakanthi

L. S. Saraswathi   S. Rajalakshmi

Bengali Sriparna Tamhane

Artist Uma Krishnaswamy

দেখার জন্য তিন দিন



হেলেন কেলার (১৮৮০-১৯৬৮) ছিলেন একজন দৃষ্টি ও শ্রবণপ্রতিবন্ধী নারী; তিনি তাঁর সমগ্র জীবন মানবসেবায় উৎসর্গ করেছিলেন।

দৃষ্টিশক্তিহীন হয়ে বেঁচে থাকার অভিজ্ঞতা নিয়ে হেলেন বেশ কিছু প্রবন্ধ রচনা করেছিলেন। এখানে তাঁর লেখা এমনই একটি প্রবন্ধ—যার শিরোনাম 'Three Days to See' (দেখার জন্য তিন দিন)—থেকে কিছু অংশ তুলে ধরা হলো।

সম্প্রতি আমার এক অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ বান্ধবী আমার সাথে দেখা করতে এসেছিলেন; তিনি তখন বন-জঙ্গলের ভেতর দিয়ে দীর্ঘ পথ হেঁটে ফিরেছেন মাত্র। আমি তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম, তিনি সেখানে বিশেষ কী কী নিরীক্ষণ করেছেন। তিনি উত্তর দিলেন, "বিশেষ কিছু না।"

আমি মনে মনে ভাবলাম—এ কি করে সম্ভব? এক ঘন্টা ধরে হাঁটার পরেও এমন কিছুই চোখে পড়ল না যা উল্লেখ করার মতো? অথচ আমি—যার দৃষ্টিশক্তি নেই—কেবল স্পর্শের মাধ্যমেই কত শত বিষয় খুঁজে পাই যা আমাকে মুগ্ধ করে। আমি একটি পাতার সূক্ষ্ম ও সুষম গঠন অনুভব করি। আমি পরম মমতার সঙ্গে আমার হাত বুলিয়ে দিই 'সিলভার বার্চ' গাছের মসৃণ বাকলের ওপর, কিংবা কোনো পাইন গাছের অমসৃণ ও কর্কশ বাকলের ওপর। বসন্তকালে, শীতের দীর্ঘ ঘুম শেষে প্রকৃতির জেগে ওঠার প্রথম লক্ষণ—অর্থাৎ একটি নতুন কুঁড়ির সন্ধানে—আমি পরম আশার সাথে গাছের ডালপালা স্পর্শ করি। মাঝে মাঝে, যদি আমি খুব ভাগ্যবান হই, তবে কোনো ছোট গাছের ওপর আলতো করে হাত রেখে আমি অনুভব করতে পারি—সেখানে বসে কোনো পাখি হয়তো তখন পূর্ণ কণ্ঠে গান গাইছে, আর তার শরীরের সেই আনন্দের শিহরণ আমার হাতে এসে লাগছে।

কখনো কখনো, এই সবকিছু নিজের চোখে দেখার তীব্র আকাঙ্ক্ষায় আমার হৃদয় আকুল হয়ে ওঠে। আমি যদি কেবল স্পর্শের মাধ্যমেই এতখানি আনন্দ লাভ করতে পারি, তবে দৃষ্টিশক্তির মাধ্যমে যে কত অপার সৌন্দর্য আমার সামনে উন্মোচিত হতো! আমি মনে মনে কল্পনা করেছি—যদি আমাকে দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়ে দেওয়া হতো, তবে সবার আগে আমি কী দেখতে চাইতাম। আহা! যদি মাত্র তিন দিনের জন্য আমি দৃষ্টিশক্তি ফিরে পেতাম, তবে কত কিছুই না আমি দেখতে পেতাম!

প্রথম দিনটি কাটত অত্যন্ত ব্যস্ততার মধ্য দিয়ে। আমি আমার সকল প্রিয় বন্ধুকে আমার কাছে ডেকে নিতাম এবং দীর্ঘক্ষণ ধরে তাদের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকতাম—যাতে তাদের অন্তরের সৌন্দর্যের যে বাহ্যিক প্রকাশ, তা আমি আমার মনের গভীরে গেঁথে নিতে পারি।





আমি আমার বন্ধুদের চিনি কেবল তাদের মুখের স্পর্শের মাধ্যমে। আমার আঙুলের ডগার স্পর্শেই আমি তাদের মুখের আদল বা অবয়ব 'দেখতে' পাই। আমি তাদের হাসি-কান্না এবং আরও অনেক সুস্পষ্ট আবেগ-অনুভূতি স্পর্শের মাধ্যমেই বুঝতে পারি। কিন্তু আমি জানি না—চোখের মাধ্যমে, যা কি না 'আত্মার জানালা' হিসেবে পরিচিত—কীভাবে একজন বন্ধুর অন্তরের গভীরে দৃষ্টিপাত করা যায়।

সবার আগে আমি দীর্ঘক্ষণ ধরে তাকিয়ে থাকতে চাই আমার প্রিয় শিক্ষিকার মুখের দিকে—যিনি আমার শৈশবে আমার জীবনে এসেছিলেন এবং আমার সামনে এই বিশাল বহির্জগৎ-এর দুয়ার উন্মুক্ত করে দিয়েছিলেন। আমি তার চোখে সেই চারিত্রিক দৃঢ়তা দেখতে চাই, যা তাকে প্রতিকূলতার মুখে অবিচল থাকতে সক্ষম করেছে; এবং সেই সম্পূর্ণ মানবজাতির প্রতি সমবেদনা দেখতে চাই, যা তিনি আমার কাছে এতবার প্রকাশ করেছেন । আমি সেই বইগুলো দেখতে চাই, যা আমার কাছে মানবজীবন ও মানবাত্মার গভীরতম প্রবাহগুলোকে উন্মোচিত করেছে। আর আমি আমার কুকুরগুলোর সেই বিশ্বস্ত ও আস্থাশীল চোখের দিকে তাকিয়ে থাকতে চাই—যাদের উষ্ণ, কোমল ও কৌতুকময় বন্ধুত্ব আমাকে অপার স্বস্তি এনে দেয়।

দৃষ্টিশক্তি ফিরে পাওয়ার সেই প্রথম দিনের বিকেলে আমি বনের ভেতর দিয়ে দীর্ঘ পথ হাঁটব এবং প্রকৃতির জগতের সৌন্দর্যে আমার চোখকে বিভোর করে তুলব। আর আমি একটি রঙিন সূর্যাস্তের মহিমার জন্য প্রার্থনা করব। আমার মনে হয়, সেই রাতে আমি আর ঘুমাতে পারব না।

পরের দিন আমি ভোরের আলো ফোটার সাথে সাথেই জেগে উঠব এবং সেই রোমাঞ্চকর অলৌকিক দৃশ্যটি দেখব, যার জাদুতে রাত রূপান্তরিত হয় দিনে। আমি সবিস্ময়ে সেই আলোর চমৎকার দৃশ্যপটের দিকে তাকিয়ে থাকব, যার স্পর্শে সূর্য ঘুমন্ত পৃথিবীকে জাগিয়ে তোলে।





এই দিনটি আমি উৎসর্গ করব অতীত ও বর্তমানের জগতকে এক পলক দেখে নেওয়ার উদ্দেশ্যে। জাদুঘরগুলোতে গিয়ে আমি মানুষের অগ্রগতির সেই শোভাযাত্রাটি প্রত্যক্ষ করতে চাইব। সেখানে আমার চোখ দেখবে পৃথিবীর ইতিহাসের এক সংক্ষিপ্ত রূপ—প্রাণী ও মানুষের ছবি, যা তাদের নিজস্ব প্রাকৃতিক পরিবেশে চিত্রিত; দেখব ডাইনোসর ও ম্যাসটোডনদের বিশাল বিশাল কঙ্কাল—যারা পৃথিবীতে মানুষের আবির্ভাবের বহু আগেই এই ধরায় বিচরণ করত।



আমার পরবর্তী গন্তব্য স্থল হবে শিল্পকলা জাদুঘর। দৃষ্টিশক্তির এই দ্বিতীয় দিনে, আমি মানুষের শিল্পের মধ্য দিয়ে তার আত্মার গভীরে প্রবেশ করার চেষ্টা করব। যে ভাস্কর্যগুলোকে আমি কেবল স্পর্শের মাধ্যমেই চিনতাম, এখন আমি সেগুলোকে স্বচক্ষে দেখব। আরও চমৎকার বিষয় হল, চিত্রকলার সেই বিশাল ও মহিমান্বিত জগতটি আমার সামনে উন্মুক্ত হয়ে যাবে।

দৃষ্টিশক্তির এই দ্বিতীয় দিনের সন্ধ্যাটি আমি কোনো নাট্যশালা কিংবা সিনেমা হলে কাটাব। আমি ভাবি—আপনাদের মধ্যে কতজনই বা আছেন, যারা কোনো নাটক, চলচ্চিত্র কিংবা কোনো দৃশ্যকাব্য দেখার সময় সেই 'দৃষ্টিশক্তির অলৌকিকতা'র কথা উপলব্ধি করেন এবং তার জন্য কৃতজ্ঞতা জানান—যে দৃষ্টিশক্তি আপনাদের সেই দৃশ্যের রঙ, লাবণ্য ও গতিময়তা উপভোগ করার সুযোগ করে দেয়? আমি একজন নৃত্যশিল্পীর লাবণ্যকে কেবল অস্পষ্টভাবেই কল্পনা করতে পারি; যদিও ছন্দের আনন্দ সম্পর্কে আমার কিছুটা ধারণা আছে, কারণ অনেক সময় মেঝের কম্পনের মধ্য দিয়ে আমি সঙ্গীতের তাল বা স্পন্দন অনুভব করতে পারি। আমি বেশ ভালোভাবেই কল্পনা করতে পারি যে, সেই ছন্দোবদ্ধ গতিময়তা নিশ্চয়ই পৃথিবীর অন্যতম মনোরম একটি দৃশ্য।

পরের দিন সকালে, আমি আবার ভোরের আলোকে অভ্যর্থনা জানাব—নতুন নতুন আনন্দ এবং সৌন্দর্যের নতুন নতুন রূপ আবিষ্কারের প্রবল আগ্রহ নিয়ে। আজ—অর্থাৎ এই তৃতীয় দিনটি—আমি কাটাবো কর্মচঞ্চল বাস্তব জগতে; সেই সব জনাকীর্ণ স্থানে, যেখানে মানুষ তাদের প্রাত্যহিক জীবনের কাজকর্ম নিয়ে ব্যস্ত থাকে। শহরই হয়ে উঠবে আমার গন্তব্য স্থল।



প্রথমে আমি শহরের কোনো এক ব্যস্ত মোড়ে গিয়ে দাঁড়াই; কেবল মানুষের দিকে তাকিয়ে থাকি এবং তাদের দেখার মধ্য দিয়েই তাদের প্রাত্যহিক জীবন সম্পর্কে কিছু বোঝার চেষ্টা করি। আমি মানুষের মুখে হাসি দেখি, আর তাতে আমার মন আনন্দে ভরে ওঠে। আমি দেখি মানুষের চোখে দৃঢ় সংকল্প, আর তাতে আমি গর্ব অনুভব করি। আমি দেখি মানুষের দুঃখ-কষ্ট, আর তাতে আমার হৃদয়ে গভীর সহমর্মিতা জেগে ওঠে।

এরপর আমি 'ফিফথ অ্যাভিনিউ' ধরে হেঁটে চলি। আমি আমার দৃষ্টিকে কিছুটা অস্পষ্ট বা ঝাপসা করে ফেলি—যাতে কোনো একটি নির্দিষ্ট বস্তুর দিকে আমার নজর না পড়ে, বরং চোখের সামনে কেবল রঙের এক জীবন্ত ও বিচিত্র জগত ভেসে ওঠে। আমি নিশ্চিত যে, জনসমুদ্রের ভিড়ে নারীদের পোশাকের বিচিত্র রঙের যে সমাহার ভেসে বেড়ায়, তা নিশ্চয়ই এক অত্যন্ত চমৎকার দৃশ্য—যা দেখে আমি কখনোই ক্লান্ত হবো না।

ফিফথ অ্যাভিনিউ থেকে আমি পুরো শহরটি ঘুরে দেখি—বস্তিতে যাই, কারখানায় যাই এবং সেই সব পার্কে যাই যেখানে শিশুরা খেলাধুলা করে। সুখ ও দুঃখ—উভয় জগতের সব দৃশ্য দেখার জন্য আমি আমার চোখ দুটিকে পুরোপুরি মেলে রাখি; যাতে আমি মানুষের জীবন ও জীবিকা সম্পর্কে আরও গভীরভাবে জানতে পারি এবং আমার উপলব্ধির জগতকে আরও সমৃদ্ধ করতে পারি।

4মধ্যরাতে অন্ধত্ব থেকে আমার এই সাময়িক মুক্তি বা বিরতি শেষ হয়ে যাবে; আর আবার আমাকে গ্রাস করে নেবে সেই চিরস্থায়ী অন্ধকার রজনী। স্বভাবতই, এই স্বল্পস্থায়ী তিনটি দিনের মধ্যে আমি আমার কাঙ্ক্ষিত সব দৃশ্য দেখে শেষ করতে পারব না। কেবল তখনই—যখন আবার অন্ধকারের চাদর আমাকে ঢেকে ফেলবে—আমি মর্মে মর্মে উপলব্ধি করতে পারব যে, কত কিছুই না আমার দেখা বাকি রয়ে গেল! কিন্তু আমার মন এমন সব চমৎকার স্মৃতিতে পরিপূর্ণ হয়ে থাকবে যে, অনুশোচনা করার মতো সময় আমার হাতে খুব কমই থাকবে। এরপর থেকে, যেকোনো বস্তুর স্পর্শই আমার মনে সেই বস্তুর রূপের এক উজ্জ্বল স্মৃতি জাগিয়ে তুলবে।

সম্ভবত, দৃষ্টিশক্তি নিয়ে আমি কীভাবে আমার সেই তিনটি দিন অতিবাহিত করব—তার এই সংক্ষিপ্ত রূপরেখাটি আপনার নিজের ঠিক করা কর্মসূচির সাথে মিলবে না; বিশেষ করে যদি আপনি আগে থেকেই জানতেন যে, আপনি শীঘ্রই অন্ধ হয়ে যেতে চলেছেন। তবে আমি এ ব্যাপারে নিশ্চিত যে, আপনি যদি সত্যিই এমন পরিণতির মুখোমুখি হতেন, তবে আপনি আপনার চোখ দুটিকে এমনভাবে ব্যবহার করতেন—যা আগে কখনো করেননি। আপনার দৃষ্টিসীমার মধ্যে আসা প্রতিটি বস্তুই তখন আপনার কাছে অত্যন্ত প্রিয় হয়ে উঠত। আপনার চোখ যেন তার স্পর্শ ও আলিঙ্গন দিয়ে আপনার দৃষ্টিসীমার ভেতরের প্রতিটি বস্তুকে আপন করে নিত। আর ঠিক তখনই—অবশেষে—আপনি প্রকৃত অর্থে 'দেখতে' পেতেন; আর আপনার সামনে উন্মুক্ত হতো সৌন্দর্যের এক সম্পূর্ণ নতুন জগত।

আমি—যিনি দৃষ্টিহীন—দৃষ্টিশক্তি সম্পন্ন মানুষদের উদ্দেশ্যে একটি পরামর্শ দিতে পারি। আপনারা আপনাদের চোখ দুটিকে এমনভাবে ব্যবহার করুন, যেন মনে হয়—আগামীকালই আপনারা অন্ধ হয়ে যাবেন। আর এই একই পদ্ধতি আপনারা আপনাদের অন্যান্য ইন্দ্রিয়গুলোর ক্ষেত্রেও প্রয়োগ করতে পারেন। মানুষের কন্ঠস্বর, পাখির কলতান কিংবা কোনো অর্কেস্ট্রার সুগম্ভীর সুর—সবকিছুই এমনভাবে শুনুন, যেন মনে হয়—আগামীকালই আপনারা বধির হয়ে যাবেন। প্রতিটি বস্তুকে এমনভাবে স্পর্শ করুন, যেন মনে হয়—আগামীকালই আপনাদের স্পর্শশক্তি লোপ পেতে চলেছে। ফুলের সুবাস নিন, প্রতিটি গ্রাস পরম তৃপ্তির সাথে আস্বাদন করুন—যেন মনে হয়—আগামীকাল থেকে আপনারা আর কখনোই কোনো কিছুর ঘ্রাণ বা স্বাদ গ্রহণ করতে পারবেন না। আপনাদের প্রতিটি ইন্দ্রিয়েরই পূর্ণ সদ্ব্যবহার করুন। তবে সবকটি ইন্দ্রিয়ের মধ্যে, আমি নিশ্চিত যে—দৃষ্টিশক্তিই হল নিঃসন্দেহে সবচেয়ে আনন্দদায়ক ও উপভোগ্য।

Publisher Rajalakshmi Srinivasan Memorial Foundation

P. Saraswati V. Vijayakanthi

L. S. Saraswathi S. Rajalakshmi

Bengali Sriparna Tamhane

Artist Uma Krishnaswamy